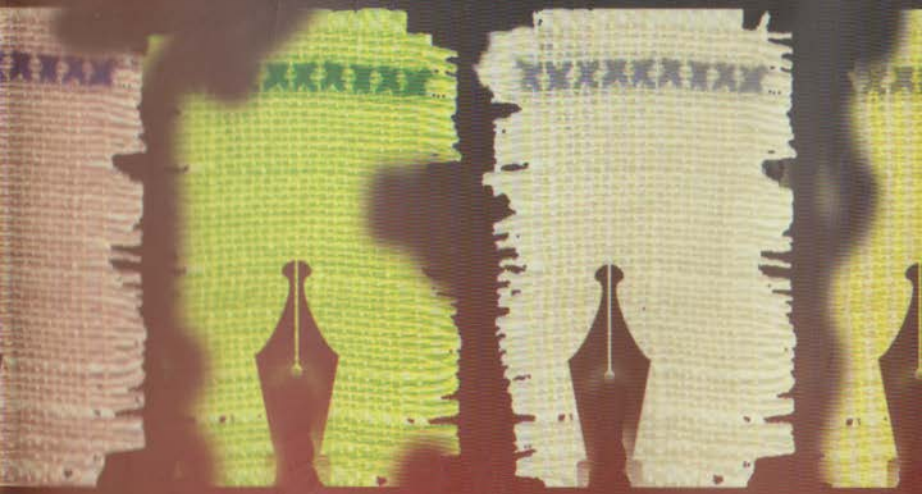

নির্বাচিত কলাম

আফতাব চৌধুরী

নির্বাচিত কলাম

আফতাব চৌধুরী

উৎস প্রকাশন ॥ ঢাকা

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ২০০৮

স্বত্ব
হামনা খানম চৌধুরী
এবং মাহবুব, মারুফ, মাসুদ
ব্লক # এ, রোড # ৩, হাউস # ১
শাহজালাল উপশহর, সিলেট

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : + ৮৮-০২-৯৬৭৬০২৫

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

মুদ্রণ
নিউ রাজধানী প্রিন্টার্স, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য
দুশ' টাকা • পাঁচ মার্কিন ডলার • তিন পাউন্ড

Nirbachito Kolam by Aftab choudhury Published by Utso prakashan
127 Aziz Supermarket 2nd flr. Shahbag Dhaka-1000
Phone : + 88-02-9676025 Price Taka 200/- • $ 5 • £ 3

ISBN : 984-70059-0100-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা
মরহুম আব্দুস সোবহান চৌধুরী
আম্মা
সৈয়দা আফতাবুন্নেছা-এর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আফতাব চৌধুরী শুধু সাংবাদিক কিংবা কলামিস্টই নন, তিনি সময়ের একজন সাহসী সন্তানও বটে। সময়ের সাহসী সন্তান বলছি এ-কারণে, তার কলম ক্ষুরধার। পত্র-পত্রিকায় নিত্য লিখে চলেছেন বিরামহীনভাবে, সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে। তার লেখাগুলো শুধু বিশ্লেষণধর্মী নয়, অনেক ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনামূলকও। সাহিত্যক্ষেত্রে তার বিচরণ সমানতালে। বাংলা সাহিত্যের আলোকস্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম এবং বেগম রোকেয়াসহ অনেক সাহিত্য ও বিজ্ঞানমনীষীকে নিয়েও তার রচনার ভাণ্ডার বেশ স্ফীত। বয়সে এখন তিনি প্রায় প্রবীণ কিন্তু তারপরও তার চলাফেরা ও লেখালেখি একজন সজীব-প্রাণবন্ত তরুণের মতোই। আফতাব চৌধুরীকে শুধু একজন সাংবাদিক, কলামিস্ট, বিশ্লেষক কিংবা সাহিত্য-গবেষক হিসেবেই গণ্ডিবদ্ধ করে রাখার উপায় নেই। তিনি একজন পরিবেশবাদী, ভ্রমণপিপাসু এবং বৃক্ষপ্রেমিক। অসংখ্য বৃক্ষ তার হাতের যত্নে বেড়ে উঠেছে যা বিপুল মানুষের প্রাণ জুড়ায়, সরবরাহ করে অক্সিজেন। এ-বৃক্ষরাজি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে রেখে চলেছে বিরাট অবদান, প্রকৃতিকে করছে সবুজ, পরিবেশকে করছে সমৃদ্ধ। এর স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন জাতীয় পুরস্কার (স্বর্ণপদক)। আফতাব চৌধুরীর যেসব লেখা এখানে মলাটবদ্ধ হলো এগুলোর মূল্য সবদিক থেকেই রয়েছে। লেখকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও বইটির প্রচারসাফল্য কামনা করি।

কামাল লোহানী

ঢাকা
২৬ ডিসেম্বর ২০০৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

১. ইদানীং (অক্টোবর ১৯৯২)
২. সত্যের মুখোমুখি (অক্টোবর ১৯৯৪)
৩. আলোর সন্ধানে (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭)
৪. ইতিকথা (ডিসেম্বর ২০০১)
৫. জীবন ও জগৎ (জুলাই ২০০৫)
৬. কৌতুক (ফেব্রুয়ারি ২০০৮)
৭. নির্বাচিত কলাম (ডিসেম্বর ২০০৮)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

১.	আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে সত্যাশ্রয়ী হওয়াই উত্তম	১৩
২.	আমেরিকার সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা	১৮
৩.	প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ	২৬
৪.	ফলাফল বিপর্যয় : সরকারি বনাম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩১
৫.	জেনারেশন গ্যাপ : নতুন প্রজন্ম কি পেলো—কি হারালো?	৩৬
৬.	বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক বিপর্যয় : অশনি সংকেত	৪১
৭.	বার্ধক্যে নিঃসঙ্গ জীবন : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৪৮
৮.	নেপালের নারায়ণহিতি : রাজাবিহীন রাজপ্রসাদ	৫৫
৯.	উষ্ণায়ন ও বায়ু দূষণের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া	৫৯
১০.	মার্কসবাদের সুবিধাবাদে আত্মসমর্পণ!	৬৬
১১.	কৃষিসহ ক্ষুদ্রশিল্প ও মৎস্য উৎপাদন : প্রয়োজন অগ্রাধিকার	৭১
১২.	হুণ্ডি বন্ধ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি : প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ	৭৯
১৩.	দারিদ্র দূরীকরণে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বাগ্রে প্রয়োজন	৮৪
১৪.	দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : নিরসনের সন্ধানে	৯১
১৫.	তিব্বতের পাহাড়ে রেললাইন : আশ্চর্যজনক হলেও সত্য	৯৭
১৬.	চীন ভারত সম্পর্কে যুগপৎ সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব	১০২
১৭.	সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাবাস : উৎস ও সমাধান	১০৫
১৮.	সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অধিকার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার	১০৯
১৯.	সৎকাজ : জনগণের ব্যবস্থা অর্জনের সহজ পন্থা	১১৬
২০.	কচিকাঁচাদের আচরণ ও তাদের প্রতি যথার্থ ব্যবহার	১২০
২১.	উন্নত প্রযুক্তির রাজধানী—প্রাচ্যের ব্যাঙ্গোলোর	১২৪
২২.	নোবেল বিজয়ী স্যু-কি এবং মায়ানমার	১২৮
**	লেখক পরিচিতি ও গুণীজনদের মন্তব্য	১৩৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে সত্যাশ্রয়ী হওয়াই উত্তম

সত্য, মিথ্যা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণাটা কেমন? যা সত্য অর্থাৎ যা প্রকৃত বাস্তব, সঠিক বা বিদ্যমান তাকে আশ্রয় করা, সত্য বর্ণনা করা, সত্যকথা বলা, সত্যপথে চলা এটা সবার জন্য না হলেও অনেকেরই জীবনাদর্শ। আপনি হয়তো এদেরই একজন। কারণ ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন—সদা সত্য কথা বলবে কখনো মিথ্যা বলবে না। শুনেছেন, মিথ্যাবাদী রাখালের দুর্দশার কথা। আর একটু বড় হয়ে পড়েছেন 'Beauty is truth, truth is beauty' এভাবে আদর্শবাদের উপর বিশ্বাস আপনাকে সত্যাশ্রয়ী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে অথচ পরিপার্শ্ব আপনাকে তা হতে দিচ্ছে না। বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন কি—সদা সত্য কথা বলেছেন? কখনো মিথ্যা বলেন নি, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও সত্যভ্রষ্ট হননি।

বস্তুত সত্য ও মিথ্যাকে নিয়ে আমাদের নিত্য ঘর-সংসার করতে হয়। শুধু সত্যকে নিয়ে যেমন আমাদের জীবনের চাকা সব সময় চলে না, তেমনি মিথ্যাকে নিয়েও জীবন একসময় অচল হয়ে পড়ে। আমরা নিজেদের যতই নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শবান বলে ভাবি না কেন, সত্য ও মিথ্যাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চাই-ই চাই।

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মিথ্যাশ্রয়ী আমাদের কাছে অশ্রদ্ধেয়, ঘৃণ্য। কিন্তু সব সময় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিটি আমাদের কাছে শ্রদ্ধার যোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারেন। অনুরূপভাবে, বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তিও আমাদের কাছে অশ্রদ্ধেয় বা ঘৃণার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না।

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তে আসা যাক। দু'দলে দাঙ্গা চলছে। কোনও নিরীহ বা নিরপরাধ ব্যক্তিকে তাড়া করে আসছে এক অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত ব্যক্তিটি এক সত্যাশ্রয়ী গৃহস্থের বাড়িতে এসে আশ্রয় চাইল। আশ্রয়প্রার্থী দুয়েক কথায় তার অবস্থাটা গৃহস্বামীকে বুঝিয়ে বলায় তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন। খানিক পরে জিঘাংসু ব্যক্তিটি এসে গৃহস্বামীর কাছে জানতে চাইল, শিকার তাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে কিনা? সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিটি যদি সত্য কথা বলেন, তবে নিরপরাধ আশ্রয়প্রার্থী বেঘোরে প্রাণ হারাবে। আর তিনি যদি মিথ্যা বলে আশ্রয়দানের কথা অস্বীকার করেন, তাহলে আশ্রয়প্রার্থী প্রাণে বেঁচে যায়। এ পরিস্থিতিতে তিনি কোন পথ অবলম্বন করবেন? এ স্থলে সত্যের পথ পরিহার করে মিথ্যার পথ আশ্রয় করা শ্রেয়তর নয় কি? একটি প্রাণতো বেঁচে যাবে। এটিকে যত মহৎ কার্য বা পুণ্যকর্ম বলি বা না বলি, তাতে কিছু যায় আসে না, এটা যে একটি ভালো কাজ তা সবাই স্বীকার করবেন।

অবশ্য এমনও হতে পারে, গৃহস্বামীর কথায় হত্যোদ্যত ব্যক্তিটি বিশ্বাস না করে শরণাগতকে খুঁজে পেয়ে বের করে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে বসল। কেবল তাই নয়, ভুল পথে পরিচালিত করার বা মিথ্যা বলার জন্যে আশ্রয়দাতা হত্যাকারী গৃহস্বামীকেও নির্মমভাবে হত্যা করল। এক্ষেত্রে, সত্যনিষ্ঠ গৃহস্বামীর শ্যাম ও কুল-দুটোই গেল। তিনি যেমন সত্যকে রক্ষা করতে পারলেন না, তেমনি হত্যাকাণ্ড রোধ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। ফলশ্রুতি? একটি নিরীহ, নিরপরাধ আশ্রিত লোককে তিনি যে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এটাই-বা কম কিসে? কারণ জীবন তো দেওয়ার জন্য, নেওয়ার জন্য নয়।

ছোটকালে প্রাইমারি স্কুলে হাতের লেখা মুখস্থ করতে আমাদের অনেক নীতিকথা শিখতে হয়েছিল। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেসব শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। যেমন 'সদা সত্য কথা বলবে', 'কখনো মিথ্যা কথা বলবে না', 'মিথ্যা বলা মহাপাপ' ইত্যাদি। এসব নীতিবাক্য আমাদের স্কুলের দেয়ালে লেখা থাকত। আমরা নির্বিচারে এসব সুভাষিতে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জেনেছি, অভিজ্ঞতাই আমাদের বলে দিয়েছে—'সদা সত্য কথা বলা যায় না। কোনো কোনো সময় প্রয়োজনে মিথ্যা কথাও বলতে হয়। মিথ্যা বলা সব সময় পাপ নাও হতে পারে।

ঘরের দিকে ফিরে তাকানো যাক। ছেলে ভীষণ দুষ্ট। সব বিষয়ে তার অসীম কৌতূহল। বাবার সদ্য কেনা শখের ফুলদানিটা নাড়াচাড়া করতে করতে হাত

www.pathagar.com

থেকে পড়ে ভেঙে গেল। বাবা অফিস থেকে ফিরে ব্যাপারটা জানতে পারেন। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'কে ভেঙেছে ফুলদানিটা?' ছেলে সত্য কথা বলল। 'আমার হাত থেকে পড়ে ফুলদানিটা ভেঙে গেছে বাবা। বাবা রেগে গিয়ে তিরস্কার করে বললেন—'কি দরকার ছিল ওটা নিয়ে নাড়াচড়া করার? আবার যদি কোনো জিনিসে হাত দিস, হাত ভেঙে দেবো।' ছেলে পরবর্তী পদক্ষেপে যদি অসর্তক কোনো কিছু ভেঙে ফেলে, সে কি আর সত্য কথাটি বলবে? যেচে বকুনি খেতে কে চায়? আবার দেখুন, একটি ভীতু মেয়ে আরশোলা দেখলে যে ভয় পায়, সে জেনে গেছে ভয় পাওয়াটা সম্মানজনক নয়, লজ্জাকর—তার কাছে জানতে চাওয়া হলো—সাপ দেখে ভয় পায় কিনা? ভেতরে ভয় পেয়ে থাকলেও বাইরে সে জানাল—'সাপ কেন, বাঘ দেখেও আমি ভয় পাই না।' এ যে মিথ্যা বলা, এটা সতীর্থদের কাছে নিজের সাহসিকতা প্রমাণ করার জন্য—তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এ অমৃত ভাষণ তাকে আত্মমর্যাদা দান করল। এটা মিথ্যাচার এবং নিন্দনীয়?

যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারিটি সরকারি সংস্থার ফান্ডের টাকা নয়ছয় করতে অভ্যস্ত, সে কি সত্য বলে স্বখাত সলিলে ডুবে মরবে? এতটা আহাম্মক সে নয়। যে সব রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, শিক্ষক, সমাজসেবী আদর্শবাদের কথা বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন, নিজেদের ইমেজকে ধোয়া তুলসীর মতো পবিত্র বলে জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তাঁদের অধিকাংশ যে মিথ্যাবাদী—এটা নিগূঢ় সত্য, প্রমাণের জন্য সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে না। তারা সত্যবাদী হতে পারেন না এবং এটাই ঘটনা।

ন্যায়ের রক্ষক ন্যায়ালয়গুলোর অবস্থা কেমন দেখুন। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করতে হয়—'যা বলব সত্য বলব, সত্য বই মিথ্যা বলব না।' এরপর আমরা দেখি সাক্ষীদের কেউ কেউ সত্য বললেও, অনেকে শপথের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গড়গড় করে অজস্র মিথ্যা বলে যাচ্ছে। এমন কি যে প্রকৃত খুনি, সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও নিজেকে নিরপরাধ বলছে অর্থাৎ অসত্য বলছে। যত বড় অপরাধী হোক না কেন নিজেকে বাঁচাতে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় এবং তা আইনজীবীর পরামর্শেই। মিথ্যাকে অবলম্বন করে অপরাধী যদি শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায়, তবে সমাজের কি মঙ্গল হয়? তখন সত্যের জয় একটি হাস্যোদ্দীপক প্যারাডক্স হয়ে দাঁড়ায়।

দাম্পত্য জীবন সুখের হয় শুধু কি সত্যের ওপর সৌধ রচনা করে? পরিসংখ্যান নিয়ে কখনো কি দেখা হয়েছে—কতজন স্বামী-স্ত্রী সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী? যা

www.pathagar.com

জেনেছি বা জানানো হয়েছে তা সত্য? যা জানিনি বা জানানো হয় নি তা মিথ্যা? প্রাক বৈবাহিক জীবনে তার স্ত্রীর কোনও প্রেমিক ছিল কিনা, থাকলে তার সঙ্গে কোনো যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা—এসব বিষয়, কিছু অস্বস্তিকর বলে, অধিকাংশ স্বামী এড়িয়ে যান।

অনুরূপভাবে তার স্বামীর বিবাহপূর্ব প্রেমিকা ছিল কিনা, থাকলে তা প্রেমশয্যা পর্যন্ত এগিয়েছিল কিনা এসব বিষয় কিছু স্ত্রী জানতে আগ্রহী হতে পারে। ফ্রি-সেক্সে যারা বিশ্বাস করেন, তারা প্রাক বৈবাহিক শারীরিক সম্পর্ক উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু যারা মুক্ত যৌনজীবনে বিশ্বাস করেন না—সত্য কখনো সেখানে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির ঘূর্ণিঝড় বয়ে দিতে পারে। আর তার ফলে সুখনীড় নষ্টনীড়ে পরিণত হতে বিলম্ব হয় না। তাই এসব ব্যাপারে সংযত হয়েই চলা উচিত।

এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'Where ignorance is bliss, it is fall to be wise' টমাস হার্ডির 'Tess of the Garberville' উপন্যাসের টেসের কথা স্মরণ করুন। সরলা টেসএঞ্জেল ক্লেয়ারকে বিয়ে করে তার বিবাহপূর্ব জীবনের আলেক নামক পুরুষটির সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক ও সন্তানটির কথা বলে নিজের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সত্য প্রকাশ না করলে তার এ ভোগান্তি হতো না। ইংরেজি সাহিত্যের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? বাংলা চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের 'পিকু' বা অপর্ণা সেনের 'পরমা'-র কথা স্মরণ করুন। 'পিকু' ছায়াছবিতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহকর্ত্রী (পিকুর মা) যখন ভরদুপুরে তার প্রেমিকের সঙ্গে নিজ শয়নকক্ষে সহবাস করে, অসুস্থ শ্বশুরের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে, তখন বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতা কি বিনষ্ট হয় না? অন্যত্র, মধ্যবয়স্কা পরমার সমর্থ স্বামী থাকা সত্ত্বেও হাঁটুর বয়সী চিত্রশিল্পী তরুণটির সঙ্গে স্টুডিওতে ন্যুড-স্টাডিতে অংশ নেওয়া, পরিণামে শয্যাসঙ্গিনী হওয়া আমাদের সমাজ চেতনায় কি আঘাত করে না? এ দুটো ঘটনা স্বামীর অনুপস্থিতে সংঘটিত। নিজ নিজ পতিকে বিবাহিত দুই নারী এ অবৈধ সম্পর্ক বা সত্য জানালে দাম্পত্য সম্পর্কটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে? যেসব স্বামী বা স্ত্রী নিয়মিত দশটা-পাঁচটা অফিস করেন তাদের কারো কারো পরস্ত্রী বা পরপুরুষের সঙ্গে একটা প্রেম বা ছদ্মবেশী প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। এসব সত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুহায় নিহিত থাকে, প্রকাশ পেলে বিপর্যয়। মানুষ প্রকৃতপক্ষে জন্মায় অসভ্য অবস্থায়, পরে সে সভ্য হয় এবং স্বভাবের দিক থেকে সে বহুগামী, অন্যান্য জন্তুর মতো। সভ্যতা তাকে সংযত করে। কিন্তু

www.pathagar.com

বহুগামীতার একটি প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করে যায়। তাই সময়, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশে পরনারী বা পরপুরুষ সম্ভোগে তা চরিতার্থ করতে চায়। স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াটা সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা অন্তর্গত হলেও, 'Vareity is the spice of life'-এর প্রতি আসক্তিটা সহজ প্রবৃতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এক স্ত্রী বা এক স্বামী আর কতদিন ভালো লাগে? একটু মুখ বদল দরকার। কারণ, ঘরকা মুরগি দাল বরাবর। সমাজে 'ব্যভিচার' নামে পরিচিত আচরণকে মিথ্যাচার দিয়ে ঢেকে রাখার কত না প্রয়াস চালানো হয়। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখার মতো ব্যাপার। ন্যায় বিচারে আমরা জানি, সত্যের জয় আর অন্যায় বিচারে? অসত্যের জয় অর্থাৎ মিথ্যার জয়। যেখানে সত্যের নেই কোনো অধিকার। আদালতের বিচারে আমরা দেখেছি—প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করা যায়নি বলে অনেক খুনি, নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এখানে সত্য পদদলিত। যেসব মা-বাবা পুত্র কন্যাকে চরিত্রবান, নীতিবান, আদর্শপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হতে বলেন, সেসব মা-বাবা নিজেরাও কি তেমন? তাঁদের যদি দেখি ঘুষ খেতে, কাজে ফাঁকি দিতে বা কর্মক্ষেত্র থেকে সামগ্রীর কিছু কিছু চুরি করে ঘরের কাজে লাগাতে, রাজনীতি জগতে সুবিধাবাদকে সর্বস্ব মেনে ডিগবাজি খেতে, গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে, তবে তাঁরা কি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে মিথ্যাচারীতে পর্যবসিত হন না?

গার্হস্থ্য জীবনে আমরা যে ঘরের অন্যান্য সদস্যের মতো সত্য-মিথ্যাকে নিয়ে ঘর করি তার এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী। তিনি তাঁর 'অভিনেত্রী' গল্পে দেখিয়েছেন—গৃহিণীকে কিভাবে গৃহের নানা সম্ভাব্য বিপর্যয়ে, বিপদে-আপদে যুদ্ধমান দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে নিপুণ অভিনয় করে যেতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে প্রত্যেকের মন যুগিয়ে শ্যাম ও কুল রক্ষা করে গৃহশান্তি বজায় রাখতে হয়। গৃহশান্তির জন্য এ যে অভিনয় অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয়ের মূল্য কি অস্বীকার করতে পারি?

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি যে মিথ্যানিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রতিনিয়ত পরাজিত হন বা হচ্ছেন তার একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত পাই 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসের মহিম মাস্টারের চরিত্রের মাধ্যমে। সত্যনিষ্ঠ আদর্শবান এ মানুষটি সহকর্মীদের হাতে, সমাজের, সবার হাতে (যাদের মধ্যে তাঁর আত্মজাও রয়েছে) মার খেয়ে খেয়ে তাঁর ছাত্র-পুত্রের কাছে এক চরম সত্যবাণী উচ্চারণ করেন (যাতে তাঁর চরম হতাশা ও অসহায়তা ব্যক্ত হয়ে পড়ে) : স্তিমিত দৃষ্টি বইয়ের উপর মেলে ধরে

www.pathagar.com

মহিম মাস্টার পড়াচ্ছেন—'সদা সত্য কথা বলবে। যে সত্য কথা বলে সবাই তাকে ভালোবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে কেউ তাকে ভালোবাসে না, সবাই তাকে ঘৃণা করে।' পড়াতে পড়াতে মহিম মাস্টার স্তব্ধ হলেন এক মুহূর্ত। বলেন 'বানান করে পড়, মানে শিখে নে কিন্তু বিশ্বাস করিসনে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা।' সংবাদ মাধ্যমগুলো সাধারণত সত্য-সংবাদ পরিবেশন করে। তথ্য সংগ্রহ-উৎসে যদি ত্রুটি থাকে অথবা সাংবাদিক তথা পত্রিকা-সম্পাদক যদি খারাপ মনোভাবাপন্ন হন, তাহলে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে। এর ফলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, দাঙ্গা হয়। যার পরিণতি কখনো সুখপ্রদ হয় না। এসব ক্ষেত্রে মিথ্যাচার পরিহার্য, কিন্তু সর্বদা প্রতিরুদ্ধ হয় না। সাহিত্য স্রষ্টারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যার অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ফটোগ্রাফিক ট্রুথ বা বাস্তবের হুবহু রূপায়নে আর যা হোক সাহিত্য হয় না। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মেশানো সাহিত্যকে আরো হৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। কল্পনাকে বাস্তবের মতো করে প্রকাশ করার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন, যা সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে লভ্য।

মিথ্যা তথা মায়াকে নিয়ে ইহলোকের সুখ-দুঃখের পাঁচালি রচিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। অতএব, বলতে হয় মিথ্যাও সত্য; সে অস্তিত্বহীন নয়। (যে বিদ্যমান নয়, তাকে নিয়ে এত কাণ্ডকারখানা হয়)। তবে, এ সত্য রঙিন, দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর, বর্ণালির বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। অপর পক্ষে সত্য-নিষ্ঠুর রঙহীন, তবে অনুজ্জ্বল নয়, সত্য ও মিথ্যা দুটোই আমাদের জীবনসঙ্গী। তবে, স্বার্থোদ্ভূত মিথ্যা অনেক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, কারণ সে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তার স্বরূপ উন্মোচনে আমাদের সচেষ্ট থাকাটাই কাম্য।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা

তিনি কালো মানুষ কিন্তু ভালো মানুষ। তাই যত কালো হন না, মার্কিনীদের মন মজেছে ওবামাতে। নিজের দলের প্রার্থী হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন হাসিল করেছেন ওবামা। এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের সবার চেয়ে তিনি হোয়াইট হাউসের চেয়ার দখলের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। প্রেসিডেন্ট হলে আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হবেন ওবামা।

www.pathagar.com

ব্যারি ওরফে বামা ওরফে রক ওরফে ওবামা। যে নামে ডাকা হোক না কেন তিনি আসলে বারাক হুসেইন ওবামা, জুনিয়র। পেশায় অ্যাটর্নি, বয়স ৪৭, লম্বায় ৬ ফুট ১ ইঞ্চি (১.৮৭ মিটার)। বাবার মতো কালো তিনি। বাবা আফ্রিকান, বারাকের বাবার বাড়ি কেনিয়ার সিয়েরা জেলার ন্যাঙ্গোমাকোগেলোতে। বারাকের বাবা কেনিয়া সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ছেলের যা নাম, বাবারও তাই নাম ছিল বলে বাবার নামের পাশে ওবামা সিনিয়র (বড়) লেখা হয়। সিনিয়র ওবামা তার বাবার সঙ্গে গরু, ছাগল, দেখাশোনা করতেন ঠিক কিন্তু পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন। পরিবারের ভরণপোষণের তাগিদে কম বয়সে সরকারি চাকরিতে ঢুকে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিয়েও করে ফেলেছিলেন। কেনিয়া সরকার মেধাবী সিনিয়র ওবামাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার্থে। স্ত্রী জেকিয়াকে দেশে রেখে সিনিয়রের আমেরিকা যাত্রা। প্রথমে ইউনিভার্সিটি অব হাউই-এ, পরে হার্ভার্ড এবং বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়েও সিনিয়র পড়ালেখা করেন। হাউই-এ রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার ক্লাসে আমেরিকার কানসাসের মেয়ে স্ট্যানলি অ্যান ডুনহামের সঙ্গে পরিচয় হয় সিনিয়রের। তাকে বিয়ে করেন, সেই অ্যানের গর্ভে ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট হনলুলুর কাপিওলানি মেডিক্যাল সেন্টারে জন্ম বারাক ওবামা জুনিয়রের। জুনিয়র বারাকের বয়স যখন মাত্র তিন বছর, তখন সিনিয়র বারাকের সঙ্গে অ্যানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। হার্ভার্ড থেকে অর্থনীতিতে এমএ করে সিনিয়র কেনিয়ায় ফিরে যান। তখন ১৯৬৫ সাল। অন্যদিকে জুনিয়র বারাকে বয়স যখন ছয়, অ্যান বিয়ে করেন ইন্দোনেশিয়ান লোলো সোইটোরোকে। লোলো ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার এক তেল কোম্পানির ম্যানেজার। তখন অ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এ সময় লোলোর সঙ্গে পরিচয়। লোলোকে বিয়ে করে জুনিয়র ওবামাকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় চলে যান অ্যান। লোলো ছিলেন মুসলমান, লোলোর ঔরসে অ্যানের গর্ভে জন্ম নেয় একটি মেয়ে। নাম মায়া সোইটোরো। সে মেয়ে এখন হনলুলুতে স্কুল শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ান। জাকার্তায় থাকাকালীন আমেরিকান দূতাবাসে ইংরেজি শেখানোর কাজ করেন অ্যান। জুনিয়র বারাকের বয়স যখন দশ বছর, তখন অ্যান লোলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে হাউই চলে আসেন ছেলে-মেয়ে নিয়ে।

এরপর অ্যানের বাপের বাড়িতে অর্থাৎ দাদা-দাদির কাছে থেকে জুনিয়র ওবামা এবং তার সৎ বোন বড় হয়ে পড়ালেখা করে। জুনিয়র ওবামার গর্ভধারিণী অ্যান পড়াশোনায় ভালো ছিলেন, বক্তা হিসেবেও। অ্যানের বাবা স্ট্যানলি ছিলেন

www.pathagar.com

আসবাব বিক্রেতা এবং ব্যর্থ মনোরম বীমা এজেন্ট। মা মেডলিন ছিলেন ব্যাংক কর্মী, প্রথমে ওরা সিয়াটেলে থাকতেন। অ্যানের বয়স যখন তেরো, তখন ওয়াশিংটনের মার্সাল আইল্যান্ডে চলে যান। অ্যানকে ভর্তি করেন নামি মার্সাল আইল্যান্ড হাইস্কুলে। এরপর অ্যান মানোয়ার হাউই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান নিয়ে পড়েন। অ্যান ছিলেন সমাজকর্মী, পরিবর্তনকামী বামপন্থী। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্পকে ঘিরে তিনি ঘানা, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডে কাজ করেছেন। ১৯৯২ সালে হাউই থেকে নৃতত্ত্বে পিএইচডি করেন তিনি। ১৯৯৫ সালে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে স্তন ও জরায়ু মুখের ক্যানসারে অ্যান মারা যান।

বাবা আফ্রিকান, মা আমেরিকান। তাই জুনিয়র বারাককে আফ্রিকান-আমেরিকান বলা হয়। তবে নাগরিকত্বের নিরিখে বারাক পুরোদস্তুর আমেরিকান। কেনিয়া সরকারের উচ্চ পদে থাকার সুবাদে সিনিয়র ওবামা হামেশা আমরিকাসহ নানা দেশে যেতেন সফরে। বারাককে তিনি জীবনে শেষবারের মতো দেখতে গিয়েছিলেন একবার যখন জুনিয়রের বয়স ছিল ১০।

জুনিয়র বারাক অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় পুনাহাউ স্কুলের প্রিপারেটরি একাডেমীতে পড়ার পর ইন্দোনেশিয়া থেকে আমেরিকায় ফিরে আবার হনলুলুর পুনাহাউ স্কুলে পড়েন। তারপর লস অ্যাঞ্জেলসের অক্সিডেন্টাল কলেজে দু'বছর।

এরপর নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূল বিষয় ছিল। ১৯৮৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুনিয়র বারাক গ্র্যাজুয়েট হন। বিজনেস ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন নিউইয়র্ক পাবলিক ইনটারেস্ট রিসার্চ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত হন। চার বছর নিউইয়র্কে কাজ করার পর শিকাগো চলে যান জুনিয়র ওবামা। ১৯৮৫ সালের জুন থেকে ১৯৮৮ সালের মে পর্যন্ত ডেভেলপিং কমিটি প্রোজেক্টর ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। জব ট্রেনিং প্রোগ্রাম, কলেজ প্রিপারেটরী টিউটোরিং প্রোগ্রাম ছাড়া ভাড়াটেদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষাদান করার সুবাদে সমাজসেবার কাজে খুব নাম করেন জুনিয়র। এরপর গ্যামালিয়েল ফাউন্ডেশনের হয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি সপ্তাহের জন্য ইউরোপ সফরে, ফিরে এসে পাঁচ সপ্তাহের সফরে কেনিয়া যান। সেখানে গিয়ে তার বড় মা মানে সৎ মা কেজিয়াসহ অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৮৮ সালে হার্ভার্ড ল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৯০ সালে প্রথম 'কালো' সভাপতি নির্বাচিত হন 'হার্ভার্ড ল রিভিউ'-র। ১৯৯১ সালে

www.pathagar.com

হার্ভার্ডে পড়াশোনা শেষ করেন, ফিরে যান শিকাগোতে। লেখা শুরু করেন আত্মজীবনী 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার।'

১৯৯৩ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ডেভিস, মাইনার, বানহিল এ্যান্ড গ্যালান্ড কোম্পানির সহযোগী এ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করেন জুনিয়র। একদিকে জনহিতকর মামলা লড়া, অন্যদিকে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ল স্কুলে সংবিধান নিয়ে আংশিক সময়ে অধ্যাপনার কাজ দু'টোই একসঙ্গে চালিয়ে যান তিনি। ২০০৪ সালে মার্কিন সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারি ওবামা যখন ইলিনোইসের সেনেটর হিসেবে শপথ নেন, তখন তিনি বয়সের বিচারে ১০০ জন সেনেটরের তালিকায় ছিলেন ৯৯ তম স্থানে। শিকাগোর কেনউডের বাসিন্দা বনে যাওয়া সিংহ রাশির জাতক ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেনেটর হবার ১৩ বছর পূর্বে বিয়ে করেন। এ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করার সময় জুনিয়র ওবামার সঙ্গে পরিচয় হয় শিকাগোর মেয়ে মিশেল রবিনসনের। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ল স্কুলে পড়া মিশেল তখন শিকাগোর আইনি পরামর্শদাতা কোম্পানি সিডনী অ্যান্ড অস্টিনে কাজ করতেন। ১৯৯১ সালে মিশেল স্বামীর সঙ্গে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এ্যাটর্নির কাজ ছেড়ে দেন। জুনিয়রের সঙ্গে ওবামার বিয়ে হয় ১৯৯২ সালে। তাদের দুই মেয়ে। মালিয়া অ্যান, জন্ম ১৯৯৮ সালে। অন্যজন সাশা ওরফে নাতাশা, জন্ম ২০০১ সালে। দেশে থাকলে যত কাজ থাকুক না কেন, রাতে বাড়ি ফিরে দুই মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কাটাতে বেশি ভালোবাসেন জুনিয়র।

প্রথমবার ২০০০ সালে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে ঠাঁই পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। পরের বারের জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছিলেন, ফল ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে সেনেটর। এ সেনেটর হিসেবে লড়াইয়ে নেমে ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে যে বক্তৃতা করেছিলেন জুনিয়র তথা ব্যারি ওবামা, তা শুধু হৃদয়স্পর্শী ছিল না, বারাক প্রমাণ করেছিলেন তাঁর বাবা এবং গর্ভধারিণীর কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিভাকে তিনি মোক্ষম সময়ে কাজে লাগাতে পারেন, পারবেনও।

নির্বাচনী কারচুপি, উষ্ণায়ন, জ্বালানিতে দেশকে স্বাবলম্বী করা, ইরাক থেকে ফৌজ ফিরিয়ে আনা কেন উচিত ছিল আগেই, এরকম সব বিষয়ে সহজ-সরল করে উপস্থাপন করতে পারেন তিনি। সাদ্দাম হোসেনকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইরাক ছাড়ার ফতোয়া জারি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। শিকাগোয় ইরাকে

www.pathagar.com

যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু না করার আর্জি জানিয়েছিলেন জুনিয়র বারাক। অধিকাংশ আমেরিকানদের কাছে ব্যারি তাই হন। না যতই কালো, কিন্তু ব্যারি ভালো।

রাত সাড়ে ৯ টায় বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বারাক লিখতে বসেন। হলুদ রঙের প্যাডে বারাক লিখে চলেন তার ভাবনার কথা, যেসব কথা, সেসব কাহিনী তিনি আপামর মানুষের সামনে হাজির করতে চান। রাত ১টা পর্যন্ত লিখে চলেন, সে লেখা পরে টাইপ করার সময় মাজাঘষা করেন। বারাকের মন্তব্য, দিনে তো অনেক কাজ, লেখার সময় কোথায়? তাছাড়া ভাবনার বৃত্তকে সম্পূর্ণ করতে গেলে নির্জনতা দরকার হয়। তাই রাতের অর্ধেকটা সময়কে লেখার জন্য বেছে নেওয়া। এভাবে লিখে ফেলা 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার', 'দ্যা অডাসিটি অফ হোপ'।

বারাক জানিয়েছেন, 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার' লিখতে শুরু করার পূর্বে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, আদৌ লিখতে পারবো কিনা। কারণ বইটিতে আমার ছোটবেলা, আমার পরিবারের কথা এসব তন্নিষ্ঠভাবে লিখব ভেবে শুরু করেছিলাম। লিখতে গিয়ে দেখলাম, খুব পারছি। যেন আরো একবার নতুন করে আবিষ্কার নিজেকে। 'দ্যা অডাসিটি অফ হোপ' এ দেশ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়, দেশবাসী দেশকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেন, প্রতিদিন দেশের যে কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খাটেন, সেসব নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন বারাক। এতে আপামর দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর চিন্তা-ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। এ বইয়ে দেশে স্কুল ব্যবস্থার উন্নয়ন ভাবনার পাশাপাশি তেল তথা জ্বালানি সমস্যার মোকাবিলার বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে শিশু স্বাস্থ্যসেবার সমৃদ্ধিসহ সামগ্রিক শিশু কল্যাণের কথা। দয়ালু বারাক তার লেখার মাধ্যমে বুঝিয়ে ছেড়েছেন, দেশের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ উঠে আসে, সেসবের মোকাবিলা করার মতো স্থৈর্য এবং ধী আছে তার। অতএব, দেশবাসী তার উপর ভরসা রাখতে পারেন। হ্যাঁ, এক সময়ের পোকার এবং বাস্কেটবল খেলোয়াড় বারাক রাজনীতির ময়দানে পা রাখার ১১ বছরের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা। জুনিয়র জানাতে ভোলেন না, 'সমাজসেবার মানসিকতা পেয়েছি গর্ভধারিণীর থেকে। বাবার যে বড় হবার স্বপ্ন ছিল, রাষ্ট্রনেতা হবার স্বপ্ন ছিল তা জেনেছি মায়ের কাছ থেকেই।'

আমেরিকার যার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা, সে জুনিয়র বারাক ওবামার বড় মা অর্থাৎ সিনিয়র বারাকের স্ত্রী কেজিয়ার মুখে এবার শোনা যায়

www.pathagar.com

তাদের পরিবারের কথা, জুনিয়র বারাকের বাবার কথা। কেনিয়ার মেয়ে কেজিয়া এখন বেশির ভাগ দিন ইংল্যান্ডের ব্র্যাকনেলে মেয়ের কাছে থাকেন। তার কথা, বারাকের সৎ মা আমি। বারাকের বাবা সিনিয়র ওবামার প্রথম স্ত্রী। তিনি বিয়ে বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। ১৯৮৫ সালে যখন জুনিয়র কেনিয়া এল তখন আমি তাকে প্রথম দেখি। দেখে মনে হয়েছিল অবিকল তার বাবার মতো হয়েছে। যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিই আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন। তখন জুনিয়রের গর্ভধারিণী অ্যান ডুনহাম বেঁচে ছিলেন, এর ৯ বছর পর ক্যান্সারে মারা যান অ্যান। জুনিয়র বারাকের নামটি সিনিয়রের দেয়া। বারাক মানে জগৎপিতার আশীর্বাদ ধন্য, সম্ভবামি যুগে যুগে। বারাকের বাবা মারা যাবার পর অ্যান কেনিয়ায় এসেছিলেন আমাদের দেখতে। অ্যান ছিলো আমার বোনের মতো। অ্যানের সঙ্গে পূর্ব থেকে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। আমাদের মধ্যে ছিল দারুণ সম্পর্ক। কেনিয়ায় পৈতৃক ভিটেতে আসার জন্য অনেকদিন থেকে উন্মুখ ছিল জুনিয়র। এসে বাবার কবরে শ্রদ্ধাপর্ণ করেছিল। খুব শান্ত ছেলে আমার এ জুনিয়র বারাক। তখন দেখেছি, এখন দেখছি, সময় পেলে সে ইতিহাসের বই পড়ে। সব মানুষ তার কাছে সমান, সে ক্লিনার হোক আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোক। ভাইবোনসহ সিনিয়রের সৃষ্ট গোটা পরিবার ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, আমার স্বামী এটাই চাইতেন। ভেঙে যাওয়া পরিবার আবার একত্রিত হোক, এই ছিল তার প্রার্থনা।

কেনিয়ায় এরপর বারাক গিয়েছেন। আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হয়। আমার গর্ভে তিনটি ছেলে। নাইরোবিতে বার্নাড আর অ্যাবো থাকে। বার্নাডের যন্ত্র-সরঞ্জামের ব্যবসা। অ্যাবো ইন্টারন্যশনাল টেলিফোন শপের মালিক। বড়টির নাম রয়। সে নাইরোবিতে থাকে। গ্রামের মাদ্রাসায় পড়া শেষে সে ওখানে গিয়ে পড়ে এ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে। আমার মেয়ে আউমা দক্ষিণ ইংল্যান্ডে থাকে।

এরপর কেজিয়া তার বিয়ের কথায় চলে যান, 'তখন ষোড়শী, স্কুলে পড়ি। বারাকের বাবা তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার বাড়ি যেখানে, সে কেন্দুবেতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। বয়সে আমার থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন সিনিয়র বারাক। ছাগল পালনের জীবিকা ছেড়ে সবে নাইরোবিতে একটি সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি পেয়েছেন। এক প্রেক্ষাগৃহে নাচের অনুষ্ঠানে ছিল। সেখানে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের সাথে গিয়েছিলাম সেদিন। পরদিন খবর এল আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে সিনিয়র বারাকের। ডিসেম্বর মাস, স্কুলে তখন ছুটি

www.pathagar.com

চলছে। পর পর কয়েকদিন দেখা হলো, কথা হলো। স্টেশনে গিয়েছিলাম নাইরোবির ট্রেনে তুলে দিতে। বাই বাই করা হলো না, সিনিয়র বারাকের কথা শুনে ট্রেনে চেপে পড়েছিলাম। আমার বাবা ছিলেন ড্রাইভার, সিনিয়র ওবামাকে তার পছন্দ হয়নি। বাবা নাইরোবিতে চলে এসেছিলেন আমাকে ফিরিয়ে নিতে। বলেছিলেন, পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে। যাবনা বলায় জানিয়েছিলেন, আর কোনোদিন কথা বলবেন না।'

সিনিয়র বারাকের বাবা অবশ্য আপত্তি করেন নি। সিনিয়র বারাক আমাকে বিয়ে করছেন জানিয়ে আমাদের বাড়িতে বাবা, মাকে পণ হিসেবে ১৪টি গরু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিনিয়র বারাকের বাবা পাচক ছিলেন। কেনিয়ায় থাকা ব্রিটিশদের জন্য রান্নাবান্না করতেন। খাসভৃত্য ছিলেন তাদের। ছেলের বউয়ের বাড়িতে ১৪টি গরু কিনে পাঠাতে ধারদেনা হয়েছিল বৈকি।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে নাইরোবিতে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য যে কর্মীনিবাস বানানো হয়েছিল জেরিকোতে, সেখানে গিয়ে ঘরকন্না শুরু করলাম। পরের বছর মার্চে আমাদের ছেলে রয় জন্মালো। সিনিয়র বারাক যে প্রতিভাবান, তা জরিপ-যাচাই করে সরকার তাকে বৃত্তি মঞ্জুর করে আমেরিকায় পাঠাল পড়তে। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকাল চলছে তখন। পেটে তিন মাসের কন্যা আউমা, এয়ারপোর্টে গেলাম। সিনিয়র আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, কাঁদতে শুরু করে দিলাম। সে উড়ে গেল হাউইয়ে।

কানসাস থেকে পড়তে আসা সহপাঠিনী অ্যানের সঙ্গে হনলুলুতে ক্লাস করতে গিয়ে পরিচয় সিনিয়রের। কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ে করেন তারা। ১৯৬১ সালের আগস্টে আজকের এ জুনিয়র বারাকের জন্ম। বারাক এরপর হার্ভার্ডে চাকরি পেয়ে যান। অ্যান এবং জুনিয়র বারাককে রেখে ইস্ট কোস্ট্ ইউনিভার্সিটিতে চলে আসেন। এক তেল কোম্পানির ম্যানেজারকে বিয়ে করে অ্যান ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়। সিনিয়র বারাক আমাকে অ্যান এবং তাদের ছেলের ছবি পাঠিয়েছিল, চিঠি লিখত নিয়মিত। হার্ভার্ডে পড়াতে গিয়ে সিনিয়র বারাক যে ন্যাঙ্গোমা কোগেলোতে এক আমেরিকান শিক্ষিকার প্রেমে পড়েছেন তা জানিয়েছিলেন। রুথ নামে সে মহিলা জানতেন না সিনিয়রের আরো দু'জন স্ত্রী রয়েছেন, তাদের ছেলেপুলে আছে।

১৯৬৫ সালে রুথকে নিয়ে বারাক কেনিয়ায় ফিরে আসেন। আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, এখন কোনো চাকরি-বাকরি নেই, বাড়িঘর নেই। যখন আমি কিছু একটি কাজ পেয়ে থিতু হব, তখন পাকাপাকিভাবে তোমার কাছে ফিরে আসব।

www.pathagar.com

জোমো কেনিয়াত্তা সরকার গঠন করলে সিনিয়র বারাককে প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। সিনিয়রের সঙ্গে একদিন যেরকম কেতাদুরস্ত জীবনযাপন করার স্বপ্ন দেখতাম, সে জীবনযাপনের সাথী হয়ে গেল রুথ। তবে রুথকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম কেনিয়ার এ প্রত্যন্ত গ্রাম ন্যাঙ্গোমা কোগেলোতে পৈত্রিক ভিটেতে আমার কাছে আসতেন সিনিয়র, থাকতেন। সে সময় আরো দুই ছেলেপুলে হয় আমাদের। ১৯৬৮ সালে অ্যাবো আর ১৯৭০ সালে বার্নার্ড।

এর মধ্যে একদিন নাইটক্লাব থেকে ফেরার পথে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটলে সিনিয়রের দু'টি পা কেটে বাদ দিতে হয়। আমি হসপিটালে হাজির হলে সিনিয়র রুথকে জানান, এ আমার স্ত্রী কেজিয়া।

জুনিয়র ওবামাকে হাউইয়ে রেখে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওর মা অ্যান, দাদু-দিদার সঙ্গে ওবামা থাকত। পুনাহাউ একাডেমি দিয়ে শুরু। তার আগে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পড়েছিল বেশ কিছুদিন, ইন্দোনেশীয় ভাষায়। আমেরিকার সর্বোচ্চ স্তরের দুই নামি বিশ্ববিদ্যালয় কলম্বিয়া এবং হার্ভার্ডে পড়েছে।

খুব স্কচ খেতেন সিনিয়র ওবামা। আর্থিক সাচ্ছল্যের সময় নাইরোবির বিখ্যাত স্ট্যানলি হোটেলে বসে রাতভর ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কি খেতেন, তারপর নাকি রুথকে পেটাতেন। এসব শুনেছি। রুথের সাথে সিনিয়র সাত বছর ছিল। আরো দু-একজন মহিলার সঙ্গে সিনিয়রের সম্পর্ক হয়েছিল, জানি কিন্তু আমার সঙ্গে সিনিয়র কখনো দুর্ব্যবহার করেন নি। তবে একটি মানুষ সবদিক থেকে ১০০ শতাংশ ভালো হবে এমন আশা করা যায় না। আফ্রিকার দেশগুলোতে বহুবিবাহের চল বহুদিন থেকে, এটা জীবনের একটা অঙ্গ। সিনিয়রের সব মিলিয়ে ৮টি সন্তান। আমারগুলো ছাড়া বাকি সন্তানদের জন্য আমি একজন মা। তাই ওদের সবাইকে নিয়ে চলতে কোনো অসুবিধা হয় না।

বড় হয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের দেখা হয় নি। জুনিয়র যে বাবার মতোই অর্থনীতিসহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে, তা জেনে খুশী হয়ে মারা গেছেন সিনিয়র। একুশ বছর বয়সে কেনিয়ায় আসার পূর্বে ওর বাবা সম্পর্কে কতটুকু জানত আমাদের জুনিয়র। ওর বাবার বিদ্যাবুদ্ধি, বাগ্মিতার ধারা সব পেয়েছে সে, খারাপ দিকগুলো পায় নি। লোকে বলে সিনিয়রের পা বাদ পড়া, ১৯৮২ সালে গাড়ি দুর্ঘটনা দু'টির কারণ নাকি হুইস্কির প্রভাব। যারা এসব বলেন, তারা সিনিয়রের যেসব গুণ ছিল, সেসব নিয়ে বলেন না কেন?

www.pathagar.com

কেনিয়াতে আমাদের যেখানে বাড়ি, সেখানে লুত্ত-ভাষিক ট্রাইব সবাই। সব কুঁড়েঘর, এইডস রোগীর ছড়াছড়ি সে গ্রামে। বাড়ি বাড়ি পানির লাইন নেই, বিদ্যুৎ নেই। মুরগি আর ছাগল পালন, ভুট্টো আর ফলের চাষাবাদ।

পিতৃভূমিতে এসে এসব দেখে গেছে জুনিয়র। বাবার গুণবত্তার কথা আমার কাছ থেকে শুনেছে, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে।

শুনেছি একসময় কোকেনের নেশা করে ধরা পড়েছিল ওবামা। ছোটবেলায় এরকম ঘটনা সবার জীবনে কম বেশি ঘটে। বড় হয়ে সে ছেলে গোটা আমেরিকার মানুষের সামনে ঘোষণা করছে, আমাকে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করে দাও, তাহলে এই নাও শাদা কাগজের পৃষ্ঠা, তাতে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা লিখে জানাও। জিমি কার্টার, রোনাল্ড গান, বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ যা পারেন নি আমি সে পরিবর্তন এনে তোমাদের দেখাব।

নাম তার বারাক ওবামা। খুব সুন্দর দেখতে তার স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়ে। আমার বয়স এখন ৬৮ বছর। দু'বছর পূর্বে ইলিনোইস থেকে যাবার পর শপথ নিল যেদিন, সে অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য জুনিয়র আমাকে ওয়াশিংটনের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে নিয়ে রেখেছিল ১৫ দিন। দেখলাম, জর্জ বুশ তাকে শপথ নেওয়ালেন। তারপর পরিবারের সবাই মিলে একসাথে নৈশভোজ। জুনিয়র যখন আমেরিকায় প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হবে তখন এরকম সাধারণ নৈশভোজে মিলিত হব আমরা। আমার কাছে বারাকের পরিচয় ও তার বাবার ছেলে। বংশে প্রথম লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিল সিনিয়র, তার ছেলে জুনিয়র অ্যাটর্নি হয়েছে। এবার আমেরিকার মতো একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হবে, সে জুনিয়র আমাকে মা বলে ডাকে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

'আন্দামান'। এমন একটা সময় ছিল যখন এ নামটা শুনলে মানুষ চমকে উঠত। এ নামের সাথে আরো দু'টো শব্দ চলে আসতো 'নির্বাসন' আর 'দ্বীপান্তর'। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর ওপর রক্ত ঝরানো অত্যাচারের ইতিহাস ও ব্রিটিশ শাসনের নির্মমতার সাক্ষী এ আন্দামান। কালক্রমে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার পর আন্দামানের সে কালিমা মুছে গেছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিণত হয়েছে অতি মনোরম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি স্থানে, যাকে বলা

www.pathagar.com

যায় পর্যটকদের স্বর্গ। নতুন করে আবিষ্কার করা দূষণমুক্ত শান্ত মধুর একটি পরিবেশ।

শত শত বছর ধরে এ পর্বতময় দ্বীপমালা দাঁড়িয়ে ছিল এক অগম্য ও রহস্যজনক পরিবেশ নিয়ে। শুধু প্রাকৃতিক কারণে নয়, বাধা ছিল এখানকার আদিবাসীদের দুর্বার প্রতিরোধ। সব বাধা অতিক্রম করে এ দ্বীপমালা অনেকটা ধীরে ধীরে চলে এসেছে সভ্য জগতের আলোয়। এ দ্বীপগুলোর সূর্যকিরণ দীপ্ত সৈকত, দীপ্তিমান প্রবালরাজি, স্ফটিক স্বচ্ছ পানির মধ্যে রঙবেরঙের মাছের ঝাঁক, নানা আকার ও বর্ণের পাখির কলকাকলি, সাগর পারের নারকেলগাছের সারি, অজানা-অচেনা রঙিন ফুলের ঝাড় বা দূরে আদিবাসীদের মাদলের শব্দ সব মিলিয়ে এক কাব্যের জগৎ। এখানে এলে মানুষ ভুলে যায় নাগরিক জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা। বিভোর হয়ে যায় এক অতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে। আন্দামান তাই তুলনাবিহীন। আলাপ হয়েছিল পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো এক বিদেশী পর্যটকের সাথে। আগে দেখা কোনো পর্যটন ভূমির সাথে তিনি আন্দামানের তুলনা করতে পারলেন না। তার ভাষায়, 'এগুলো সত্যি প্রাকৃতিক'। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, উত্তর দক্ষিণে কিছুটা লম্বভাবে। এ দ্বীপপুঞ্জে আছে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৫৭২টি দ্বীপ। তার মধ্যে ভারতীয় সৈকতের সব চেয়ে কাছেরটির নাম 'কেপ প্রাইস', প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে। সবচাইতে দূরেরটি হলো 'ইন্দিরা পয়েন্ট', প্রায় ৮০০ কিলোমিটার জুড়ে। এ দ্বীপমালার মোট আয়তন হলো ৮২৫০ বর্গকিলোমিটর। এ দ্বীপপুঞ্জের মাত্র ৩৬টিতে মানুষের বসবাস আছে, মোট আয়তনের ৮৬ শতাংশ নিবিড় অরণ্য। এ দ্বীপ শৃঙ্খলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমান ভারতের কেন্দ্র শাসিত এ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী শহর পোর্টব্লেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে।

কেউ যদি ভাবেন পোর্ট ব্লেয়ার পৌছোলে আদিবাসীদের দেখতে পাবেন তাহলে তা ঠিক হবে না। প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট সুন্দর পরিচ্ছন্ন এ শহরটি কিছুটা পাহাড়ি। প্রায় দূষণমুক্ত এ শহরটিতে ভারতের প্রায় সব অঞ্চলের লোক দেখা যায়। চলতি ভাষা হিন্দী বলে পর্যটকদের কোনো অসুবিধে নেই। বাংলা ভাষাভাষি প্রচুর লোক আছে এ দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার বসবাসকারী বেশির ভাগ হচ্ছে এককালে দ্বীপান্তরিত হওয়া বন্দিদের বংশধর। নয়তো বিভিন্ন সরকারি বা অন্য কোনো কারণে এদেশে আসা লোকজনের সন্তান-সন্ততি। এদেশের জাদুকরি আবহাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে তারা রয়ে গিয়েছিলেন সেখানেই।

www.pathagar.com

আন্দামানে বেড়াতে হলে এখানে কতদিন থাকবেন তার উপর নির্ভর করবে পর্যটনসূচি। কলকাতা বা চেন্নাই থেকে যাওয়া যায় বিমানে বা জাহাজে। রাজধানী শহর পোর্টব্লেয়ারের আশেপাশে আছে অনেকগুলো দ্বীপ যেগুলো পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। যেমন—রস আইল্যান্ড, ভাইপার আইল্যান্ড, নর্থ-বে আইল্যান্ড। আরো কিছু দূরে যে কটি দ্বীপ পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সেগুলো হচ্ছে হ্যাভলক, নিল, জলিব্যোয়, সিনকুই, ব্যারেন, বারাটাং। এদের প্রতিটি তাদের নিজ নিজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশিষ্ট ও মনোরম এক একটি দ্বীপ এবং এক একভাবে আকর্ষণীয়।

রাজধানী শহর পোর্টব্লেয়ার : এ শহরের নামটি হয়েছে ইংরেজ নেভির লেফটেন্যান্ট আর্চিবাল্ড ব্লেয়ারের নাম থেকে। ১৭৮৮-৮৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অফিসারটিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এ দ্বীপে একটি উপনিবেশ বা বসতি স্থাপন করার জন্য, যাতে তাদের হয়ে কাজ করা মানুষদের বাসস্থান করা যায়। বিভিন্ন কারণে সে বসতি বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। পরে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর ব্রিটিশ সরকার ঠিক করেন অতিরিক্ত সাজা প্রাপ্ত কয়েদীদের জন্য এখানে একটি আবাস তৈরি করা হবে। সেভাবে পত্তন হয় পোর্টব্লেয়ারের, তৈরি হয় কুখ্যাত সেলুলার জেল, হলো দ্বীপান্তর।

পোর্টব্লেয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা : সেলুলার জেল, ১৯০৬ সালে এ জেলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ জেলে প্রথমে তৈরি মোট সাতটি বিভাগের মাঝে এখন মাত্র তিনটি দাঁড়িয়ে আছে। বন্দিদের রাখা হতো সাড়ে তেরো ফুট বাই সাড়ে সাত ফুট মাপের একটি কক্ষে যার প্রায় আট ফুট উঁচুতে থাকত লোহার গ্রিল বসানো একটি অতি ছোট জানালা। জেল প্রাঙ্গণে এখনো দাঁড়িয়ে আছে বীজ থেকে তেল তৈরির একটি কারখানা। এ কারখানাতে বলদের বদলে জুড়ে দেয়া হতো বন্দিদের। যে চেয়ারটিতে বসে ইংরেজ অফিসার তত্ত্বাবধান করতেন ও হাঁপিয়ে পড়া বন্দিদের 'অলস' বলে চাবুক মারতেন, সেটিও রাখা আছে সামনেই। এ জেলের ইতিহাস ও তৎকালীন জেলার ডেভিড বেরির অত্যাচারের বিবরণ রোজ সন্ধ্যায় তুলে ধরা হয় এ জেলের প্রাঙ্গণে 'লাইট এ্যান্ড সাউন্ড' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পর্যটকদের কাছে এটা এক বিশেষ আকর্ষণ। আমাদের নতুন প্রজন্ম জানে না এ অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কতটা নির্যাতিত হতে হতো ব্রিটিশ শাসকদের হাতে। ১৯৩৯ সাল থেকে এ জেলে নির্বাসন বন্ধ হয়। পাক, বাংলা, ভারতের স্বাধীনতার পর এক সময় এটিকে ঘোষণা করা হয় 'জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ' হিসেবে।

www.pathagar.com

পোর্টব্লেয়ার শহরের অন্যান্য বিশেষ আকর্ষণীয় স্থানগুলো হলো চেথাম কাঠ মিল। এটি এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো ও বড় কাঠ মিল। এর সাথে থাকা একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংগ্রহালয়ে রাখা কাঠের তৈরি বিভিন্ন রকমের মূর্তি ও আসবাবপত্র খুব আকর্ষণীয়। আরো আছে করবিনস কোভ—পোর্টব্লেয়ারের একমাত্র সৈকত, ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং আরও তিনটি সংগ্রহশালা। সমুদ্রিকায় দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের অতি দুষ্প্রাপ্য প্রবাল ও শঙ্খের সম্ভার, ফিসারিজ মিউজিয়াম, সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের সংগ্রহ, অ্যানথ্রপলজিকাল মিউজিয়াম, যেখানে দেখা যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনধারা।

রস আইল্যান্ড : এ ছোট্ট মনোরম দ্বীপটিতে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের বাসস্থান বানিয়েছিল যাতে সেলুলার জেলের বন্দিদের কাছ থেকে তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। সে সময় তৈরি ঘরবাড়িগুলোর ভগ্নস্তূপ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সযত্নে রক্ষিত এ ভগ্নস্তূপগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার বটগাছ। সারাদিন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে সময় কাটাবার জন্য অতি সুন্দর স্থান।

ভাইপার আইল্যান্ড : ব্রিটিশদের অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করছে এ দ্বীপটি। সেলুলার জেলের অবাধ্য বন্দিদের এখানে এনে পায়ে বেড়ি পরিয়ে কাজ করানো হতো। তাদের চোখের সামনে একটি ছোট টিলার ওপর আছে একটি ফাঁসি দেবার ঘর যাতে বন্দিরা বুঝতে পারে এটা তাদের অন্তিম পরিণতি। লর্ড মেয়োকে হত্যা করার অপরাধী পাঠান শের আলীকে সেলুলার জেলে শায়েস্তা করতে, না পেরে ব্রিটিশরা এখানে এনে তাকে ফাঁসি দেয়।

নর্থ বে আইল্যান্ড : পোর্টব্লেয়ারের অদূরে অতি সুন্দর এ দ্বীপটির সৈকতের কাছে স্ফটিক স্বচ্ছ পানির নিচে দেখা যায় অবর্ণনীয় সুন্দর ও মনোহর প্রবাল রাজি। স্টিমার থেকে পারে যেতে হয় নৌকায়, তার মেঝেটা কাচের আর সে কাঁচের ভেতর দিয়ে পর্যটকরা পানিতে না নেমেও দেখতে পান বিভিন্ন ধরনের প্রবাল সম্ভার।

জলিব্যোয় দ্বীপ : পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ওয়ান্ডুর জেটি। সেখান থেকে স্টিমারে করে আরো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট গেলে পাওয়া যায় জনবসতি শূন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যে অপরূপ এ দ্বীপটি। সৈকতে প্রবালরাজি, পর্যটকরা এখানে ছুটে আসেন স্কুবা ড্রাইভিং করতে। তবে এখানে আসতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। সাধারণত অনুমতি পর্যটন দফতরই দিয়ে থাকে। ওয়ান্ডুর সৈকত অতি সুন্দর।

www.pathagar.com

চিড়িয়াতাপু : পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় ত্রিশ কিমি দূরে এ স্থানটি সূর্যাস্ত দেখার জন্য বিখ্যাত। ছোট্ট টিলার ওপর বন বিভাগের তৈরি অবজারভেশন পয়েন্ট থেকে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর দেখায়।

মাউন্ট হেরিয়েট : পোর্টব্লেয়ারের কাছে দক্ষিণ আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। এক সময় ছিল ব্রিটিশদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। উপর থেকে দেখা যায় কাছের ও দূরের অনেক দ্বীপ। এ স্থানটির সৌন্দর্য এক কথায় অতুলনীয়।

হ্যাভলক আইল্যান্ড : পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দূরে এখানকার রাধানগর সৈকত এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সৈকত বলে খ্যাত। এখানকার প্রবালরাজি ছাড়াও আরো যেগুলো আকর্ষণীয় সেগুলো হলো পানিতে হাতির খেলা, গাছের মালা ও নিবিড় অরণ্যের ছায়া।

আরো যেসব দ্বীপ আছে সেগুলো পোর্টব্লেয়ার থেকে কিছু দূরে। প্রতিটি এক একরকম ভাবে সুন্দর। যেমন নীলদ্বীপ সিনকুই, জারোয়া উপজাতি অধ্যুষিত এবং ভারতের একমাত্র আগ্নেয়গিরি ব্যারেন আইল্যান্ড ইত্যাদি।

বিভিন্ন সময়ে জলোচ্ছ্বাস ও বিগত সুনামির প্রভাবে এ দ্বীপগুলোর ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। তার বেশ কিছু নজির এখনো দৃশ্যমান। তবে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় পদক্ষেপে আন্দামান সে ক্ষতি কাটিয়ে উঠে আবার পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। ভারতীয় পর্যটকদের আন্দামান বেড়াতে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেবল উপজাতি অধ্যুষিত কয়েকটি দ্বীপে যেতে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কয়েকটি দ্বীপে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিয়ে যাওয়া নিষেধ। এমনকি প্লাস্টিক বোতলে পানি নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেও বোতলগুলো ফিরিয়ে এনে দেখাতে হয়।

কিভাবে যাবেন : প্রায় প্রতিটি বিমানসেবাই দিনভর বিমান চালায়। কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যাবার ফ্লাইট আছে, দু'ঘণ্টা থেকে একটু বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। জাহাজে গেলে প্রয়োজন হয় ৩-৪ দিন, দূরুত্ব ১২৫০ কিলোমিটার। প্রতি সপ্তাহে একটি জাহাজ যায় সেখানে।

হোটেল : পোর্টব্লেয়ার শহরে পর্যটকদের জন্য বিভিন্নমানের ও দামের হোটেল আছে। আগে ব্যবস্থা করে নিলে পর্যটক নিবাসের সুন্দর ব্যবস্থাও আছে।

www.pathagar.com

ফলাফল বিপর্যয় : সরকারি বনাম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কিছুদিন ধরে তার পোস্টমর্টেম চলে। ফলাফল নিয়ে মন্তব্য-মতামত বিভিন্ন মহলে উচ্চারিত হয়। কিছুদিন পর আবার সব গতানুগতিকভাবে চলতে থাকে অন্তত পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত।

পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে মন্তব্য-বিতর্কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অতি সরলীকৃত যুক্তি প্রদান করা হয়। বিষয়ের গভীরে না গিয়ে আমরা স্টিরিওটাইপড মন্তব্যে অভ্যস্ত। ইদানিং পরীক্ষার ফল সম্পর্কিত আলোচনায় যে বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে, তা হলো সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'রেজাল্টের তুলনা'। এ বিষয়ে যেসব মন্তব্য-মতামত প্রকাশ্যে আসে তার সবগুলো এক রকম। যার মোট কথা হলো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজাল্ট খারাপ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ভালো। বিষয়ের গভীরে গিয়ে বিচার করলে এ অতি সরলীকৃত যুক্তি তেমন গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টকে এক বাক্যে ভালো বলাটা দেখানো হয়, প্রকৃত অর্থে ততটুকু নয়। ভালো-খারাপের যুক্তিনির্ভর তুলনামূলক বিচার বাঞ্ছনীয়। তুলনামূলক বিচারে কোনটা ভালো, কতটুকু ভালো সে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে অনেকগুলো দিক বিচার করতে হবে।

প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করে ধরে নেয়া যাক যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট খারাপ আর বেসরকারি (প্রাইভেট) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ভালো। এবার 'ভালো' রেজাল্ট আর 'খারাপ' রেজাল্টের প্রধান কারণসমূহের উপর আলোকপাত করে দেখা যাক ভালোটা প্রকৃতার্থে কত ভালো আর খারাপটা প্রকৃতার্থে কত খারাপ। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ক্রমাগত খারাপ হবার কারণ একাধিক। বর্তমানে, বিশেষ করে বিগত দশক দেড়েক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ধারা চলছে,তাতে বর্তমান যুগকে প্রাইভেট ইংরেজি মিডিয়ামের যুগ বলা যেতে পারে।

এদেশে স্বাধীনতার পর অনেকগুলো প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তুলনামূলক সচ্ছল অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুল, কলেজে পড়ানোর প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। তাদের ধারণা বড় হলে বা উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়ালে বা চাকুরির জন্য

www.pathagar.com

বিদেশে যেতে হলে ইংরেজির বিকল্প নেই। এ যুক্তিওতো ফেলে দেয়ার মতো নয়। কারণ আমরা দেখি আমাদের দেশে লেখাপড়া করে ভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে যেতে হলে তাদের শুধু ইংরেজি না জানার কারণে সমস্যায় পড়তে হয়। শুধু ইংরেজি না জানার কারণে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের শতশত স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত হয় এ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রিধারী ছাত্র-ছাত্রীরা। কাজেই ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নেই। আমরা দেখি যারা আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি সচ্ছল এবং যাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবী তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বর্তমানে কদাচিৎই সরকারি স্কুল-কলেজে পড়াতে পাঠান। এটা এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ছাত্রের অনুপাত ক্রমনিম্নগামী। এর ফলে দেশের নামিদামি সরকারি স্কুল-কলেজের রেজাল্টের মান নিম্নগামী।

একদা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করত, তারাই সরকারি কলেজে পড়ার বাসনা পোষণ করত। আজ আর সেটা হচ্ছে না, আজকাল সেরা ছাত্রছাত্রী কিছু তথাকথিত নামিদামি প্রাইভেট কলেজে পড়ার জন্য মোহবিষ্ট। স্বভাবতই সরকারি কলেজের রেজাল্ট আগের মতো ঈর্ষণীয় হচ্ছে না। কেননা মূলত 'ইনপুটের' উপরই যে 'আউটপুট' নির্ভরশীল, তা অস্বীকার করা যায় না। আর এ ক্ষেত্রে প্রধান ইনপুট যে ছাত্র তা-ও তর্কাতীত। আজকাল দেখা যায় একটি অঞ্চলে যখনই কোনো প্রাইভেট ইংরেজি স্কুল গড়ে ওঠে তখন ঐ অঞ্চলের ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রী সেখানে চলে যায়। সরকারি স্কুলের শোচনীয় ফলাফলে যেসব কৃতি প্রাক্তনীরা উদ্বিগ্ন তাদের ক'জন নিজের ছেলেমেয়েকে সরকারি স্কুলে পড়তে পাঠান তাও এখানে অবশ্য বিচার্য। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার জন্য ভালো ছাত্রছাত্রী মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে ভালো রেজাল্টের জন্য ছাত্র মুখ্য-প্রতিষ্ঠান গৌণ। যদি উল্টোটা সত্য হয়, তাহলে তথাকথিত নামিদামি প্রাইভেট কলেজগুলো কেবলমাত্র অতি উচ্চ নম্বর প্রাপকদের ভর্তির সুযোগ দেয় কেন—সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীর সেখানে স্থান হয় না কেন? অতি সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একশো শতাংশ রেজাল্ট দেখাতে পারলে সেটা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব কিন্তু বাস্তব চিত্র সে রকম নয়।

www.pathagar.com

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৈক্ষিক পরিবেশের ক্রমাবনতি ও পরীক্ষার ফলাফল অবনমনের জন্য সরকারি নীতি বিশেষভাবে দায়ী। প্রাইভেট স্কুল, কলেজকে যথেচ্ছভাবে অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান করে পরোক্ষ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে তেমন কোনো কার্যকরি পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সর্বজন বিদিত। দীর্ঘ বছর ধরে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় না, শিক্ষকতা বর্তমানে আর পাঁচটা চাকরির মতোই একটি। শিক্ষকসুলভ মানসিকতার হিত ব্যক্তিদের নিয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিককালে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো নির্মাণে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও সুদীর্ঘকাল সরকারি অবহেলায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এত শোচনীয় যে যথাযথ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাছাড়া, স্কুলসমূহে নিয়মিত পরিদর্শনের অভাব, শিক্ষক-শিক্ষিকার মাসান্তে বেতনের অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের ব্যবহার ও প্রশ্রয়দান, নগণ্য কারণে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পঠন-পাঠনে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। যারা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে শিক্ষাদানে নিয়োজিত রাখতে চান, তারা পরিস্থিতির শিকার হন। কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে গরিষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক অবস্থা।

অপরদিকে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ভালো' রেজাল্টের প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে ভালো ছাত্রের উপস্থিতি। মেধা ও আর্থিক সঙ্গতি এ দু'ক্ষেত্রে যারা উচ্চবর্গের তারা শুধু প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার সুযোগ পায়। এভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক 'এলিট' ক্লাসের সৃষ্টি হয় যেখানে নিজের ছেলেমেয়েকে দেওয়ার জন্য উচ্চবর্গের অভিভাবকরা মুখিয়ে থাকেন। নিম্নবর্গের অভিভাবকদের কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর সেখানে স্থান হয় না। তথাকথিত নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র প্রতি মাসিক যে 'বিনিয়োগ' তা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সারা বছরের খরচের চেয়ে অনেক বেশি। প্রাইভেট স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক নিজ সন্তানের প্রতি যতটুকু যত্ন, দায়িত্ব ও তৎপরতার পরিচয় দেন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটা লক্ষিত হয় না। সব মিলিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ভালো না হওয়াটা স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরে যারা মেধাবী প্রমাণিত হয় না তাদের সাধারণত সেখানেই আটকে দেওয়া হয়। উপরের ক্লাসে প্রমোশন দিতে হবে বলে ছাত্র বা অভিভাবক হুমকি বা আন্দোলনের সুযোগ পান না। সরকারি প্রতিষ্ঠানের চিত্র অন্যরকম। এখানে সবাইকে অ্যাডমিশন দিতে হবে—প্রমোশনও। প্রাইভেট স্কুল-কলেজে যারা পাশ করতে পারবে তাদের ফাইনালে বসতে দেয়া হয়। তাই রেজাল্ট একশো শতাংশ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা অবাস্তব।

বর্তমানে নামিদামি প্রাইভেট কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পেতে মেট্রিকে এ প্লাস বা এ পেতে হয়। তা সত্ত্বেও অনেকে সুযোগ পায় না। অপরদিকে, সরকারি কলেজে শতকরা নম্বরের কোনো বালাই নেই, সবার জন্য এডমিশন নিশ্চিত। অভিভাবকদের মধ্যে যে প্রবণতা প্রকট হচ্ছে তা হলো, ছেলেমেয়ে মেট্রিকে ভালো রেজাল্ট করলে বেসরকারি কলেজ আর খারাপ হলে সরকারি কলেজ। কাজেই এটি পরিষ্কার যে, মূলত ভালো ছাত্রের জন্য ভালো রেজাল্ট হয় প্রাইভেট স্কুল-কলেজে। সরকারি স্কুল-কলেজে যেখানে বর্তমানে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর (মেধা ও আর্থিক দিক দিয়ে) ছাত্রছাত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে একশো শতাংশ রেজাল্টের ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক নম্বর পাওয়ার জন্য অনেকটা যান্ত্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্ককে অতি ক্রিয়াশীল করে তোলা হয়। ভবিষ্যতের জন্য তা কতটুকু মঙ্গলদায়ক বা বাঞ্ছনীয় তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি উচ্চ নম্বর প্রাপকরা সে মাত্রা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং আকস্মিক পতনের মুখে পড়ে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হতাশাব্যঞ্জক ফলাফলের জন্য সেগুলো বন্ধ করে দেওয়াটা সমস্যার সমাধান নয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলে গরিষ্ঠসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। অবশ্য এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার সঠিক রূপায়নের দায়দায়িত্ব মূলত শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়। তবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কিছু পরামর্শ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

প্রথমত, সরকারি স্কুল-কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে আকর্ষিত ও উৎসাহিত করতে হবে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, ফি কনসেশন, মেধাবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে

www.pathagar.com

তা করা যেতে পারে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যত বাড়বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান তত উন্নত হবে। কম মেধাবী ছাত্রের উপর তার সহায়ক প্রভাব পড়বে। একসঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কম মেধাবী, সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট সরকারি নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। শুধুমাত্র ভালো ভালো ছাত্র নিয়ে 'ভালো' রেজাল্ট দেখানোতে প্রতিষ্ঠানের কোনো কৃতিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি স্থির করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা আরো বাড়াতে হবে। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে যথেচ্ছভাবে বেসরকারি শিক্ষা চালানোর অনুমতি প্রদত্ত হলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতি হবে। একটি সরকারি স্কুল বা কলেজের প্রবেশমুখে আরেকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের কিছুটা ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কাজেই প্রতিষ্ঠিত কোনো স্কুল বা কলেজের একটি নির্দষ্ট সীমানার মধ্যে নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান শোচনীয় নয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষকরা যাতে পূর্ণরূপে নিয়মানুগামী ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন, তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা ঠিকাদারি-রাজনীতি ইত্যাদি 'সাইড বিজনেস' নিয়ে ব্যস্ত কর্তব্যবিমুখ শিক্ষকদের 'শিক্ষা' দিতে সরকারি নির্লিপ্ততা পরিহার করতে হবে। পঠন-পাঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিত কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেয়া আবশ্যক।

চতুর্থত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা জরুরি। বর্তমানে ইন্সপেক্টর থাকলেও নজরদারি নামক জিনিসটি অস্তিত্বহীন। বছর দু'বছরে একবার 'সারপ্রাইজ ভিজিট' অর্থহীন। এতে নিরীহ কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের ভিকটিমাইজড হবার আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে–যাতে মেধাবীরা শিক্ষক হতে সুযোগ পায়। এজন্য প্রয়োজনে আর্থিকসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বাড়িতে দিতে হবে। ইংরেজি শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা একটা কোর্স শেষ করে প্রয়োজনে বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হয়। কারণ দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও আমাদের ছেলেমেয়েরা শুধু ইংরেজি না জানার কারণে বহু স্কলারশিপ হতে বঞ্চিত হয়–উচ্চশিক্ষার

www.pathagar.com

সুযোগ পায় না।

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত পরামর্শগুলোর মধ্যে নতুনত্ব তেমন নেই। সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন, উপলব্ধি করেন। সরকারি নীতি-নির্দেশিকায় তার উল্লেখও আছে। তবে যা নেই তা হলো এগুলো বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছা ও দৃঢ়সংকল্প।

জেনারেশন গ্যাপ : নতুন প্রজন্ম কি পেলো—কি হারালো?

যান্ত্রিক সভ্যতার জোয়ারে ভেসে যুগ দ্রুত গতিতে বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে যুগের হাওয়া। সম্প্রতি এক দশকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার একের পর এক অভিনব উপহার-টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল এবং ইন্টারনেট নবীন প্রজন্মকে এক কথায় 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে দিয়েছে। যা পূর্বে কল্পনাতীত ছিল। আমাদের কাছে এ যেন এক বিস্ময়! জানি না, অচিরেই কত বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগের দিনে আমাদের বুদ্ধি হবার পর পঞ্চাশ অথবা ষাটের দশকের গোড়ায় কালেভদ্রে গ্রামেত নয় শহরাঞ্চলে যার বাড়িতে রেডিও, ল্যান্ডফোন, ঘড়ি ও রেকর্ড প্লেয়ার বা কলের গান ছিল এক কথায় তিনি ছিলেন বড়লোক। বিলাস-ব্যাসন তথা উন্নতমানের জীবন যাপনের এ মাপকাঠির স্থিতাবস্থা বজায় ছিল ২৫/৩০ বছর। অর্থাৎ ঘরে ঘরে টেবিলে টেবিলে বোকা বাক্স এসে বসতি স্থাপন করার সময় ব্যয় হয়ে গেলো প্রায় ত্রিশ বছর। 'টেলিভিশন' এসে রেডিও শোনা, বই পড়ার আনন্দ উপভোগ করা এবং সিনেমা হলের মালিকদের ব্যবসার বারোটা বাজালো। এছাড়া বিশ বছরে ঐ বোকা বাক্স আর বিশেষ কোনো পরিবর্তন করে নি। একবিংশ শতাব্দীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার এমন এক জোয়ার এসেছে, যা বিগত ৪০/৫০ বছরের তার ক্রমোন্নতির রেকর্ডকে এ ক'বছরে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে! বর্তমান প্রজন্ম এক লাফে হাতে পেয়ে গেছে মোবাইল, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট। মোবাইল সেটের কথাই ধরা যাক। এতে কি নেই? বার্তা প্রেরণ, বার্তা গ্রহণ এ তো সামান্য কথা! এতে গান রেকর্ডিং করা বা শোনা, খবর শোনা, ছবি তোলা এবং তা এডিট করা, ম্যাসেজ পাঠানো বা ম্যাসেজ রিসিভ করা, ঘড়ি দেখা, তারিখ দেখা, কথা রেকর্ড করা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা ইত্যাদি আরো কত রকমের সুযোগ-সুবিধার যোগান এতে রয়েছে। আমরা কৈশোরে, যৌবনে অথবা প্রৌঢ়ত্বে এসব উপকরণের কথা কল্পনায় স্থান দিতে পারিনি। নিঃসন্দেহে বলতে পারি এদের প্রাপ্তিযোগের পাল্লাটা খুব ভারি, তবে

www.pathagar.com

এরা অনেকখানি হারালো। এরা কি পেল আর কি হারালো এটাই আজকের এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এটি মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের যুগ। কারো পাসবুকের নম্বর জানা থাকলে আপনি এখান থেকে দুই মিনিট সুদূর লন্ডনেও টাকা পাঠাতে পারেন। রাত তিনটার সময় এটিএম-এ গিয়ে টাকা তুলতে পারেন। ইন্টারনেটের সাহায্যে ঘরে বসে সুদূর আমেরিকাবাসী যেকোনো কারো সাথে যোগোযোগ রাখতে পারেন। আজকাল এসব হরদম হচ্ছে। এফডিসিতে কাল রিলিজ হওয়া ছবি তরুণরা ঘরে বসে ডিভিডির সাহায্যে আজকে দেখে নিতে পারছে। যান্ত্রিক সভ্যতার এহেন ফাস্ট যুগে সিনেমাহলে গিয়ে সময় অপচয় করছে না তরুণ প্রজন্মরা, তাই সিনেমা হলগুলো এখন ব্যবসা গোটাতে শুরু করেছে। এ যুগের ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল। এ মোবাইলের মাধ্যমে ঘরে-বাইরে, হাটে-মাঠে, রাস্তাঘাটে তারা অনর্গল শুধু কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। কি যে এত কথা? কে জানে? চিঠির যুগ শেষ! গল্প উপন্যাস পড়ছে না কেউ! অবসর সময়টা এখন অনেকে মোবাইলে কথা বলে কাটিয়ে দিচ্ছে।

তবে এতসব পেয়েও বোঝা যায়, এরা কিন্তু সুখী নয়। মনে হয়, কি যেন ওরা হারিয়ে ফেলেছে, হারাচ্ছে। ওরা কি হারালো, কতটুকু হারালো এবার আমরা তাই খতিয়ে দেখবো। জেনারেশনের প্রশ্নে আজ আমরা প্রবহমান তিন পুরুষ আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এক. আমি এবং আমরা। দুই. আমাদের ছেলেমেয়েরা। তিন. আমাদের নাতি-নাতনিরা।

এ যুগের পাপ্পা-মাম্মি অর্থাৎ আমাদের পুত্র-বধূদের অভিযোগ তাদের মিল্টন-ক্যামেলিয়াররা মানে আমাদের নাতি-নাতনিরা নাকি কিছুই খায় না! আমরা মনে মনে বলি, দুধ-ভাত নিঃসন্দেহে উপাদেয় পদার্থ কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করার শক্তির উপর নির্ভর করে এ জ্ঞান আজকের দিনের পাপ্পা-মাম্মিদের নেই।

যান্ত্রিক পদ্ধতির পড়াশোনার চাপে আজকের শিশুদের খেলাধুলা দূরের কথা, প্রকৃতির শ্যামল পরিবেশে, খোলা বাতাসে একটুখানি নিশ্বাস নেয়ার উপায় নেই। পড়াশোনার তাগিদে বাক্সবন্দি হয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওদের গোটা শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। এরা ক্ষুধাহীনতায় ভুগছে, এতে তাদের পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়ছে। ফলে এ যুগে কত ছেলেমেয়ের সুস্থ সবল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে 'গতাসু' হচ্ছে তার হিসেবে কে রাখে?

www.pathagar.com

বোধকরি, কেউ রাখে না। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয় অথচ আত্মার মৃত্যুর রাখা হয় না।

আমাদের সময় পড়াশোনার ব্যাপারে মা-বাবাদের এত মাথাব্যথা ছিল না। বাড়িতে পড়াশোনার এত চাপ ছিল না। পাঠশালায় আমাদের বিদ্যাভ্যাস হয়ে যেত। মাস্টার সাহেবদের ভয়ে বাড়িতে আমরা নিজেরাই অল্প সময়ে আমাদের পড়া তৈরি করে নিতাম। খেলাধুলা করার পুরো সুযোগ পেতাম। এছাড়া গাছে চড়া, সাঁতার কাটা কোনোকিছু আমরা বাদ দিতাম না। আজকাল সম্পূর্ণ উল্টো হচ্ছে। খেলাধুলার সময় কিছুটা পাচ্ছে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এদের সংখ্যা কম। বেসরকারি ইংলিশ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপারে 'ছাড়পত্র' নেই। এদের শুধু পড়া আর পড়া। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা যায়, 'জন্ম হতে দাঁড়ে বসে যে পাখি দুধ-ছোলা খেয়েছে, সে ভুলে গেছে যে, সেও উড়তে পারে। বাইরে তারই স্বজাতি পাখিকে উড়তে দেখে অন্য কোনো জীব বলে ভ্রম হয়। এ পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত হবে না কিছুতেই।'

আজকের শিশুকে ভোর পাঁচটায় উঠতে হয়। সাড়ে পাঁচটায় মাম্মির আঁচল ধরে আবার খাঁচায় প্রবেশ। ঘরে প্রবেশ করে ছেলেকে দুধ গেলাতে যত্নবান হন কিন্তু ছেলে দুধ গিলতে চায় না! মা তখন জোর করে দুধ গেলাতে থাকেন, কিন্তু সে বমি করে ফেলে।

মা কিন্তু দমবার পাত্রী হন। সন্ধ্যা ছ'টায় দরজায় খিল এঁটে তাকে নিয়ে বসে পড়েন পড়াশোনার কসরৎ শেখাতে। রাত দশটা অবধি চলে 'ছাগল দিয়ে জব মাড়াই'-এর কাজ! দাদা-দাদির বুক ফাটা আর্তনাদ কে শোনে? এ রক্তি নাতিটির প্রতি পুত্রবধূর এহেন যান্ত্রিক নির্যাতনে তাঁদের অন্তরাত্মা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই কারণ প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হয় না। কেননা এটা যে জেনারেশন গ্যাপ! এ গ্যাপ বা ফাঁকে পরিবারে আজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মতামত অচল, গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করার প্রচলন এ যুগে বাতিল। সেদিন এক বিয়ের পার্টিতে যোগদান করে দেখলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধকে পঞ্চাশ বছরের এক ভদ্রমহিলা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছেন, তিনি নাকি তাঁর কলেজ জীবনের স্যার। তাঁর ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি বিষ-নজরে প্রত্যক্ষ করল কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মাথা নত করল না! আমাদের ছোটবেলায় বাড়ির সম্মুখে 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম শুধু শিক্ষকদের সালাম করার জন্য। রাস্তায় সাইকেল নিয়ে চললে

www.pathagar.com

পায়ে হেঁটে শিক্ষকদের চলতে দেখলে সাইকেল থেকে নেমে শ্রদ্ধা জানাতাম। পরীক্ষার দিন একে একে বাড়ির সবাইকে সালাম করে করে দোয়া নিয়ে ঘর থেকে বের হতাম। গুরুজনেরা আমাদের এই বলে দোয়া করতেন—'পরীক্ষায় পাশ করো, মানুষ হও, জ্ঞানী হও'। এ যুগে কিন্তু এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। সালাম এবং দোয়ার পালা অনেক আগেই চুকে গিয়েছে। ক'বছর আগে আমাদের পাশের বাড়ির ক্যামেলিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেল। শোনা গেল, তার মাম্মি বলেছেন, 'দেখ ক্যামেলিয়া, তুই যদি এবার আশি শতাংশ মার্কস ক্যারি না করিস তাহলে কিন্তু আমার মরা মুখ দেখবি।' পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল ক্যামেলিয়া পেয়েছে উনআশি শতাংশ মার্কস। সে এখন কি করবে? মাকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিল। ব্যাপারটি যদিও নির্মম—অমানবিক তবু এ যুগের অভিভাবকরা কিন্তু সন্তানদের ওপর জোর করে এরূপ চাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছেন।

এটা নাকি যুগের চাহিদা। এ যুগে সব ছেলেমেয়েকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, তবেই ভাত-কাপড়! কথাটা বোধ করি অস্বীকার করার উপায় নেই। জেনারেশন গ্যাপে জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করে আজ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে কিন্তু মোবাইল, টেলিভিশন এবং কম্পিউটার সকলের চাই! চারদিকে ঢালাও ভোগবাদের এতসব উপকরণ এদের আলেয়ার মতো হাতছানি দিচ্ছে। এরা অসুখী হচ্ছে, মনমরা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে অসৎ পথে টাকা রোজগারে পা বাড়াচ্ছে।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা গল্প-উপন্যাস পড়ে না। কেননা টিভির রমরমা প্রসার বই পড়ার আনন্দকে আজ দূরে হটিয়ে দিয়েছে। এতে তারা কি হারাল? যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানে বড় নয়। কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মনসাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সবল, সচল, সজাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার সাহিত্যের উপর ন্যস্ত রয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্ম-নীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন সত্য, এ সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভেতর যা আছে, সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে।

আমাদের সময়ে মনের অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, স্বপ্ন ও সত্য সবকিছু লয় পেত বা বিকশিত হতো চিঠির মাধ্যমে। চিঠি লেখা, চিঠি পড়া এবং চিঠির জন্য প্রতীক্ষা করায় কি যে স্বর্গীয় সুখ পাওয়া যেত, সে কথা এ প্রজন্মকে বলে

www.pathagar.com

বোঝানো যাবে না। চিরন্তন, শাশ্বত সে সুষমা হারিয়ে গেল মোবাইল ফোনের ঝটকায়। এখন শুধু হ্যালো! দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের হাতে ছিল শুধু হ্যালো (বাঁশি)। সেই 'হ্যালো'তে যখন তখন তিনি শ্রীমতিকে জ্বালাতন করতেন। রাধার ক্ষমতা ছিল না উত্তর দেবার। কেননা রাধার হাতে হ্যালো ছিল না। এ ক'বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সবার হাতে 'হ্যালো' তুলে দিয়েছে। তাই এখন যোগাযোগ করতে আর অন্যদের সাহায্য নিতে হয় না অথবা চিঠিপত্রের দরকার পড়ে না।

যান্ত্রিক সভ্যতায় প্রেমও যন্ত্রদানবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমাদের সময়ে গোপনীয়তা রক্ষাতে ছিল প্রেমের সর্বসুখ। এ-প্রজন্মের হাতে পড়ে প্রেমের শাশ্বত, নৈসর্গিক রূপটি হারিয়ে গেছে। এ-যুগে ছেলেমেয়েরা প্রেমের গোপনীয়তা রক্ষার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। এরা প্রেমকে হাটে-বাজারে বিকিয়ে দিয়েছে। প্রেমকে অন্তরের সামগ্রী করে রাখতে শেখেনি। তারা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের দাবি করে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে জগজ্জননী শ্যামা মা খুব আদরণীয় ধন ছিলেন। তাই তিনি গেয়েছেন :

'আদরে হৃদয়ে রাখি শ্যামা মাকে
মন তুমি দেখো, আমি দেখি
আর যেন কেহ নাহি দেখে।'

অর্থাৎ এরূপ প্রিয়বস্তু দেখায় অন্য কেউ যেন ভাগ না বসায়। কবি হাফিজ বলেছেন, 'যা তোমার চির ইপ্সিত, যা তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত, যা তোমার অতি আদরণীয়, যা তুমি নিতান্ত দেখতে উদগ্রীব, যা তুমি দেখতে অশেষ ভালোবাসো, তোমার সেই দর্শনীয় প্রিয়তমা বা প্রিয়তমকে এমন এক নির্জন স্থানে নিয়ে বসাও যেখানে অন্য কোনো জনমানব থাকবে না এবং সেখানে প্রাণভরে, চোখ ভরে তন্ন তন্ন করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করো—তৃপ্তি পাবে, আনন্দ পাবে, মন ভরবে।' নবীন প্রজন্মের কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করার সময় কোথায়? তারা যে যন্ত্র বিশেষ। তাদের সব কাজ যন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ হওয়া চাই এবং হচ্ছে। হৃদয় দেয়া-নেয়া'য় সময় নষ্ট করার তাদের অবকাশ নেই।

প্রেমে কথাবার্তা চাল-চলনে এবং পোশাকে-আশাকে রাখঢাক নেই। দুর্নীতিতেও ঠিক যেন তাই। যান্ত্রিক সভ্যতা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, দুর্নীতি ঠিক তদ্রুপ বেগে বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসছে। এ দু'টির মুখোমুখি সংঘর্ষের

www.pathagar.com

দিন ঘনিয়ে আসছে, আমরা হয়তো সেদিন থাকবো না কিন্তু প্রজন্ম নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করবে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা, সামাজিক বিপর্যয় : অশনি সংকেত

গত কয়েকটি দশক থেকে যে কিছু শব্দ প্রায় প্রত্যেকটি প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা বা পুস্তকে উচ্চারিত হতে দেখা বা শোনা যায় 'বৃদ্ধাশ্রম' তার মধ্যে একটি। আমাদের এতদঞ্চলে যদিও বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন এখনও ততটা উপলব্ধি হয়নি কিন্তু অচিরেই যে পড়বে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এখন কথা হচ্ছে, কেন এ বৃদ্ধাশ্রম? কাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম? বলাই বাহুল্য, এটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য। যদিও ভারতের বারাণসী-বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে বৃদ্ধাদের বিশেষ করে বিধবাদের যে দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, এতদঞ্চলে তা প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও তা একান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রকাশ্যে খুব একটা দেখা বা শোনা যায় না।

খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আমরা যারা বৃদ্ধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছি বা হতে চলেছি, তারাই কিন্তু আংশিকভাবে এ অবস্থার প্রেক্ষাপটের জন্য দায়ী। কিছুটা দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা। বাকিটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিজনিত কারণ। যৌথ সমাজ ব্যবস্থা অনেক দিন হলো ভেঙে পড়েছে। বিদায় নিয়েছে মূল্যবোধ। মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। বিশ্বায়ন-এর স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা বিশ্বজয়ের অলীক স্বপ্নে বিভোর। এদিকে নিজেদের ঘর যে স্রোতে ভেসে যেতে চলেছে, নিরাশ্রয় হতে চলেছি আমরা, সেদিকে কারোরই দৃষ্টি নেই। অনেকটা সেই একচক্ষু হরিণের অবস্থা।

যৌথ সমাজ ব্যবস্থার অনেকগুলো ভালো দিক ছিল। পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকত গোটা পরিবার। ভালো-মন্দ সব কিছুরই দায়-দায়িত্ব থাকত পরিবারের কর্তার হাতে। বাকি সব সদস্যই তার নির্দেশানুযায়ীই চলতেন। এর ফলে প্রত্যেকটি পরিবারেই নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলাভাব বজায় থাকত। থাকত আচার-আচরণ, ব্যবহার বিধি, মান্যমানতার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবার আয়ের পরিমাণ সমান না থাকলেও বিচক্ষণ বয়োঃজ্যেষ্ঠ কর্তার সংসারে তেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সাংসারিক সুখ-শান্তিও খুব একটা বিঘ্নিত হতো না। কিন্তু

www.pathagar.com

পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সব কিছুই বদলায়। মানুষের মানসিকতাও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত একটা পরিবারে শান্তি বজায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ সব সদস্যের মানসিকতা মোটামুটি একই থাকে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তখনই যখন পরিবারে অন্য একটি পরিবারের সদস্য এসে সংযুক্ত হন। দুটো আলাদা পরিবারের মানসিকতা এক না-ও হতে পারে। না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বলি দিতে হয়। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। দেওয়ার মাঝে একটা অনাবিল আনন্দ, তৃপ্তি থাকে, থাকে একটি স্বর্গীয় অনুভূতি। যে কোনো দিন কাউকে কোনও কিছু দেয় নি, স্বর্গীয় সুখের মর্যাদা সে কি করে বুঝবে? বুঝতে গেলে হৃদয়বত্তা দরকার যে অনুভূতির প্রয়োজন, সেই সূক্ষ্মানুভূতি আজ কোথায়?

একান্তভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে আমরা শামুকের মতো নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছি। সরে এসেছি যৌথ পরিবারের কলকোলাহল থেকে নীরব-নিভৃত কোণে। ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবেই আমরা অনেকটাই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি। মনটাও ছোট হয়ে পড়ছে। যৌথ পরিবারে সব সদস্যের ছেলে-মেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা-খেলাধুলা করে, একই খাবার ভাগাভাগি করে খায়। যার ফলে শঠতা, নিচতা, স্বার্থপরতা এসে বাসা বাঁধতে পারে না, অনু পরিবারে যার একান্তই অভাব। এখানে His His-whose whose-টাই প্রকট। এ মানসিকতার সৃষ্টি কিন্তু একদিনে হয়নি। বহুদিন ধরে তিলে তিলে হয়েছে এবং এর জন্মদাতা কিন্তু আমরাই। আমাদের সন্তানেরা আমাদের দেখেই শিখেছে, কিভাবে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের খাতিরে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে হয়; কিছু না দিয়েই কিভাবে কিছু নিতে হয়। প্রেয় ও শ্রেয়বোধের দ্বন্দ্ব এখানে সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

ছেলেবেলায় আমাদের চাহিদা ছিল যৎকিঞ্চিত। যা পেতাম তাতেই সন্তুষ্টি ছিল। অন্তত সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করতাম। বড়দের যেমন ভয় করতাম শত হস্তের তফাতে থাকারই চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাই বলে শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনও অভাব ছিল না। হয়তো আমাদের অবচেতন মনে বড়দের কাছ থেকে বিশেষ করে বাবা, মা, দাদি বা গুরুজনদের স্নেহ-মায়া-মমতা বা আদর-যত্নের অভাববোধ থেকেই জন্ম নিয়েছিল নিজেদের ছেলে-মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-আদর এবং পক্ষান্তরে প্রশ্রয়ের মানসিকতার। এর ফল হয়েছে কিন্তু বিষম। শিব গড়তে গিয়ে নিজেদের অজান্তে আমরা বাদর গড়ে ফেলেছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিলে—বলা ভালো, পাত্রের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত দিলে উপছে

www.pathagar.com

পড়বেই। আমাদের ছেলে-মেয়েদের বেলাতেও হয়েছে ঠিক তাই। চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা তার আগেই চাহিদা পূরণ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কাছে প্রাপ্ত জিনিসের মূল্য কমে গেছে এবং অচিরেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তারপর একদিন যে দিচ্ছে অর্থাৎ দাতার গুরুত্বও ক্রমশই কমে গিয়ে গ্রহীতার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নৈকট্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে একটু একটু করে দূরত্বের এক অদৃশ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছে। ফলস্বরূপ বার্ধক্যজনিত একাকিত্ব-অসহায়তা এখন দেখা দিয়েছে এবং এক সময় নিজের অজান্তে বৃদ্ধাশ্রমের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক করতে থাকে।

পরিবেশ এবং পরিস্থিতির প্রভাব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে অনেক কিন্তু যা নিয়ে গেছে তার মূল্য অপরিসীম। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা ঘরে বসে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, যোগাযোগ করতে পারছি—বিনিময় করতে পারছি যে কোনও প্রান্তের সঙ্গে। বলতে গেলে গোটা পৃথিবীটাই আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। টিভির কথাই ধরা যাক। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি আমাদের মনসম্পদ যে কোনও জায়গায়—অনুষ্ঠানে যেখানে মনোরঞ্জনের মনোহারী সাগরে ডুব দিয়ে আমরা বুঁদ হয়ে বসে আছি। টিভি ছিল একসময় তথাকথিত মর্যাদার প্রতীক। আজকের দিনে যদিও সেই কৌলিন্য আর ঠিক ততটুকু বজায় নেই। কিন্তু তবুও চলছে এবং আশা করা যায় আরও বেশ কিছু কাল চলবে। তা চলুক আর নাই চলুক, ক্ষতি যা হবার তা কিন্তু হয়েই গেছে এবং এর রেশ চলতে থাকবে আগামী আরও বহু দশক কিংবা শতাব্দী পর্যন্ত। জানি না, 'বোকা বাক্স' কথাটার প্রচলন কে করেছিল বা কবে হয়েছিল, কিন্তু নামকরণটা এক কথায় সার্থক। বোকা বাক্সের সামনে বসে আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি বোকাই বনে গেছি। একেবারে জ্বলজ্যান্ত বোকা। ছাত্রজীবনে পড়েছি শিখেছি। Man is a social animal. টিভির কল্যাণে আমরা কিন্তু ক্রমেই অসামাজিক জীবে পরিণত হচ্ছি। হয়ে যাচ্ছি স্বার্থপরও। দু-একটি উদাহরণ আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া এক সামাজিক রীতির অঙ্গ। আগেকার দিনে চিঠির মাধ্যমে প্রবাসী আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের খবর আদান-প্রদান ছিল একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। চিঠির প্রাসঙ্গিকতা বহুমুখী। খোঁজখবর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের হাতের লেখা সুন্দরতর হচ্ছে, ভাষার ওপর দখল আসছে বা বাড়ছে, চিন্তাশক্তি বাড়ছে, মননশক্তির উন্নতি হচ্ছে। চিঠি মনের প্রতিফলন বা দর্পণ। চিঠি একটি দলিল। ভবিষ্যতের অনেক

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান মেলে চিঠির মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় অপরাধও ধরা পড়ে চিঠির মাধ্যমে। সরকারের আয়ের একটা বড় উৎস হলো চিঠি। কিছুটা হলেও বেকার সমস্যার সমাধান হয়। এ রকম আরও বহুবিধ উপকারিতাই আছে চিঠির। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, চিঠির পাঠ আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। তার বদলে প্রায় সবাই দূরভাষ দিয়েই সবাই চিঠির কাজটা সেরে নিচ্ছেন। এতে কাজটা দ্রুতগতিতে এবং সরাসরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে সুফলগুলো রয়েছে তার থেকে প্রকারান্তরে আমরা সবাই বঞ্চিত হচ্ছি।

এবার আসছি টিভির প্রসঙ্গে। প্রচলিত/চিরাচরিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী আমি হয়ত প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় অথবা বন্ধুর বাসায় গেলাম খোঁজখবর নিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্ধ্যার পর। দরজায় নক করলাম অথবা কলিংবেল টিপলাম। গৃহস্বামী অথবা অন্য কেউ দরজা খুললেন, ভেতরে টিভিতে তখন কোনও সিরিয়াল চলছে—উপস্থিত সবার চোখ সেখানে স্থিরবদ্ধ। হঠাৎ করে আমার আগমনে সবার চোখে-মুখে স্পষ্টতই বিরক্তির ছাপ, কিন্তু কপট হাসি হেসে বলতেই হয়—'ওঃ তুমি/ আপনি? এসো/আসুন, বসো/বসুন...এবং তারপরই অধরা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে একটু পরপরই চোখ চলে যাচ্ছে টিভির পর্দায়। এদিকে, আমার অবস্থা? ধ্যাৎ! ধ্যাৎ! কেন যে এলাম। অপ্রস্তুতের একশেষ এবং বোকাও। চলে গেলে বাঁচি। হয়ত উঠলামও যাবার জন্য। গৃহস্বামী বললেন—'ও যাবে/যাবেন? আচ্ছা, এসো/আসুন। আজকে কিন্তু ঠিক আসা হলো না। আর একদিন একটু সময় করে এসো/আসবেন...'। মনে মনে হয়ত বলছেন না এলেই বাঁচি। অবশ্য সব কিছুর মতো এ ক্ষেত্রেও প্রচুর ব্যতিক্রমও আছে।

গত শতাব্দীর মোটামুটি আটের দশক পর্যন্ত অবসর বিনোদনের বা বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বই পড়া ছিল একটি উৎকৃষ্ট মানের পন্থা। পড়ার বইয়ের নিচে রেখে গল্পের বই পড়েনি এমন ছেলে-মেয়ে খুব কমই ছিল। সিরিয়াস বইয়ের পাশাপাশি গোয়েন্দা কাহিনী খুবই জনপ্রিয় ছিল। বাংলার বরেণ্য কথা-সাহিত্যিক প্রায় সবার লেখনী থেকেই প্রচুর গোয়েন্দা কাহিনী তথাকথিত হট কেকের মতো বিক্রি হতো। মোহন সিরিজের জন্মদাতা শশধর দত্ত তাঁর নায়কের বিলাসবহুল প্যালেস বালিগঞ্জের 'রমাপ্রসাদ' কোথাও না থাকলেও একমাত্র তাঁর মোহন সিরিজের দৌলতে বিরাট অট্টালিকা বানাতে সমর্থ হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রভৃতি থেকে শুরু করে সঞ্জীব চ্যাটার্জী, বিনয় মুখুজ্জে (যাযাবর), কায়কোবাদ, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখকের লেখনী নিঃসৃত অমূল্য কোটেশনগুলো মুখে

www.pathagar.com

মুখে ফিরত। কিন্তু টিভির দৌলতে বই পড়ার প্রথা আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। বিবাহাদি উৎসবে বই উপহার দেওয়া একটি অতি উৎকৃষ্ট সুরুচির পরিচায়ক ছিল আজকাল যার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। এ ক্ষতিটা কিন্তু বড়ই মর্ম-পীড়াদায়ক।

এখন কথা হচ্ছে, বোকা বাক্সের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চোখের বারোটা বাজিয়ে আমরা কি দেখছি বা উপভোগ করছি? এখনকার প্রায় প্রতিটি টিভি সিরিয়ালে দেখা যায়, প্রথম কয়েকটি এপিসোডে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনাযুক্ত উপস্থাপনা। কিন্তু তারপর? দেখে-শুনে মনে হয় পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনো রাবার তৈরি হয়নি যা টিভি সিরিয়ালের রাবারকে টেক্কা দিতে পারে। আর বিষয়বস্তু? কিছু না বলাই বোধ করি ভালো। কাহিনী বিন্যাস, উপস্থাপনা পরিচালনা সাজ-সজ্জা প্রভৃতি যাদের হাতে ন্যস্ত, সে সুচতুর কলা-কুশলীরা আমাদের মতো মহান বোকা দর্শককে বোকা বাক্সের সামনে পেয়ে তাদের ইচ্ছেমতো আমাদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। বোকার মতো আমরা রি-অ্যাক্ট করে যাচ্ছি। ফায়দা লুটছে কিছু সুচতুর অসাধু ব্যবসায়ী। এ সমস্ত অপরিশীলিত কুরুচিপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটছে আমাদের সমাজের দৈনন্দিন জীবনে মারাত্মকভাবে। প্রতিনিয়ত। হাতেগোনা সিরিয়াল আছে যা পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে নিঃসংকোচে উপভোগ করা যায়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এমন সব দৃশ্যের উপস্থাপনা করা হয় যা দেখে দস্তুরমতো অস্বস্তিতে পড়তে হয়। সাজসজ্জার কথা বলতে লজ্জাই হয়। বিশেষ করে মেয়েদের সাজ-পোশাকের দৈন্য চোখে পীড়া দেয় মারাত্মকভাবে। মনে একটা কথাই জাগে যে আমাদের এ দেশে মেয়েদের শালীনতা ঢাকার মতো কাপড়ের কি এতই অভাব? লজ্জা, শালীনতা বলে কিছুই আর রইল না। সাজ-সজ্জা একটি অতি উৎকৃষ্ট শিল্প। And the best Arts is to Cencial Art. কিন্তু টিভি সিরিয়াল নির্মাতারা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ছোট করে শরীর প্রদর্শনকেই বোধ করি Best Art-এর নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চাইছেন।

এবার আসা যাক মোবাইল সংস্কৃতি সম্পর্কে। এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে বলে নেওয়া ভালো যে মোবাইলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার কোনও দ্বিমত বা বিরুদ্ধ মত নেই। প্রশ্ন বা সংশয় শুধু এখানেই যারা মোবাইল ব্যবহার করছেন তাদের সবারই এটা ব্যবহার করার সত্যি সত্যি তেমন প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে কি? যদিও বহুদিন আগেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মোবাইল জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করা

www.pathagar.com

হয়েছে—হচ্ছে, সে কুফল অনুভূত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশ যা কিছু অর্জন করছে আমরা তাই গ্রহণ করছি। সে আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধুমাত্র অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের যারা এখানে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোয়নি তাদের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি। তাদের সবারই কি সত্যিকারের প্রয়োজন আছে ব্যক্তিগত মোবাইল রাখার? সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন মনে জাগছে। ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, মোবাইল হাতে বিভিন্নভাবে মারাত্মক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে দেখা যায়, দ্বি-চক্র যানের আরোহীর এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে এ যন্ত্রটির কারণে। তার কারণ মনো-সংযোগের অভাব। গাড়ি চালাতে গেলে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন যে জিনিসটার তা হলো ঐ মনো-সংযোগ। কিন্তু মোবাইল হাতে নিয়ে কথা বললে মনো-সংযোগ ব্যাহত হতে বাধ্য, যার অবধারিত ফল দুর্ঘটনা। আমরা যারা ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক, জেনেশুনেই কি আমরা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় সন্তানদের অন্যায় আবদার মেটাতে গিয়ে তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছি। দুর্ঘটনা ঘটার পর কিন্তু আমরা আফসোস করছি কেন এটা করলাম বলে!

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আরও একটি বাস্তব সমস্যার সৃষ্টিকর্তাও কিন্তু আমরা, অভিভাবকরাই। খোলাসা করে বলাই ভালো। একই সঙ্গে চলাফেরা করা সব ছেলে-মেয়েদের কিন্তু মোবাইল কেনার বা আনুষঙ্গিক খরচ চালানোর সামর্থ্য না-ও থাকতে পারে। যাদের নেই তারা হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়ে অনেকেই। এটা বাস্তব সত্য! এবং এর থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে অনেকেই অন্যায় জেনেও প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে দেয়। বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে চরম অসম্মানজনক কাজ করে বসে। মা-বাবার আর্থিক অসঙ্গতির কথা চিন্তা না করে অভিমানবশত আত্মসাতের পথ পর্যন্ত বেছে নিতে বাধ্য হয়।

ঐ একই ব্যাপার দ্বি-চক্রযান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের অন্যায়-আবদার মেটাতে গিয়ে আমরা অভিভাবকরাই কিন্তু তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। যে বয়সের যে ধর্ম। যৌবনে মদমত্ত ছেলে-মেয়েরা ভয়ডর বলে কিছু মানতে চায় না। কথায়ই আছে, স্টিয়ারিং যার হাতে থাকে সে নিজেকে ছাড়া বাকি সবাইকে হেয় জ্ঞান করে। আজকাল মাননীয় সরকার এবং ব্যাঙ্কের বদান্যতায় গাড়ি, মোটর সাইকেল সহজলভ্য হয়ে গেছে। দ্বি-চক্রযান নেই। দুরন্ত দুর্বার গতিতে তিনজন আরোহীসহ ছুটে চলা তৃ-চক্রযানকে পাস দিতে গিয়ে রাস্তার পাশের স্তূপীকৃত

www.pathagar.com

ময়লা-কাদা-আবর্জনার স্তূপে ছিটকে সরে যাওয়া পথচারীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। হতে পারে সে পথচারী আমি—আপনি—আমরাই। ...There are many Slips between cup and thilips-এ পথ করে দিতে সরে আসা আর পথ করে নেওয়ার মাঝে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবধানের মাঝেই কিন্তু ঘটে যেতে পারে মর্মান্তিক বিপর্যয় যেটা তারুণ্যের দুর্বার গতিতে টগবগিয়ে ছুটে চলা ছেলে-মেয়েরা মানতে চায় না। এর দায়-দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরও কম নয়। ভালোমন্দ বুঝতে গেলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সে ক্ষমতা অর্জন করার অর্থাৎ ম্যাচিওরিটি আসার আগেই কিছু করতে গেলে সে অপরিণাম-দর্শিতার খেসারত দিতেই হয়।

পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মানসিকতাও বদলায়। আজ আমরাও বদলে গেছি। অনেকেই বদলে গেছে। বদলে গেছে আমাদের মূল্যবোধ। এক চরম নীতিহীনতার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে মরছি আমরা সবাই। ন্যায়বোধ-মূল্যবোধ কবেই বিদায় নিয়েছে আমাদের জীবন থেকে। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব জায়গাতে আমরা, আমাদের মা-বাবা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবরাই কাজ করছেন এবং তাদের কাজের বিনিময়ে যথারীতি পারিশ্রমিকও পেয়ে যাচ্ছেন। তবে কেন আজ পয়সা ছাড়া কোথাও কোনো কাজ হয় না? প্রাইভেট টিউটর ছাড়া পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েরা পাশ করতে পারে না! ভালো স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে ডোনেশন ছাড়া প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। এমনিতর হাজারো নেই-এর জগতে বিচরণ করছি আমরা। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি, যে মনে-প্রাণে না হলেও এসবই কিন্তু আমরা মেনে নিচ্ছি। মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ না মেনে কোনো উপায় নেই। প্রতিকারের কোনো পথ নেই। কে প্রতিকার করবে? রক্ষকই যেখানে ভক্ষক, প্রতিকারের আশা করাটাই সেখানে বোকাস। বিচারের বাণী এখানে মৌন-নীরবে-নিভৃতে কাঁদে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বললে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকাটাই প্রধান। কারণ জন্মের আগে থেকেই নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি না হওয়া অবধি সন্তানের অ্যাটাচমেন্ট থাকে মায়ের সঙ্গেই অধিক। বাবাকে সন্তানেরা পায়ইবা কতক্ষণ? যার ফলে সন্তানের ওপর মায়ের প্রাধান্যই বেশি থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্রয়ও। এ অবস্থায় সন্তানের দোষ-ত্রুটি বাবার শাসন থেকে আড়াল করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক মা-ই সন্তানদের একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন। যদিও স্বীকার করতেই হয় আগেকার তুলনায় আজকালকার মায়েরা ছেলেমেয়ের পড়াশোনা থেকে শুরু

www.pathagar.com

করে নাচ-গান বা সঙ্গীত শিক্ষা, অঙ্কন প্রভৃতি সব ব্যাপারেই অনেক বেশি যত্নশীলা এবং এগুলোতে আধিপত্যও রাখেন। এ আধিপত্য ও প্রশ্রয়ের ফল কিন্তু খুব একটা ভালো হয় না। বাবার প্রতি সন্তানের, বিশেষ করে উঠতি ছেলেদের মনে অতি সূক্ষ্মভাবে একটু একটু করে একটি মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হতে থাকে এবং কালে সেটি বিরাট আকার ধারণ করে। যার অবধারিত ফল পিতার প্রতি পুত্রের মতানৈক্য ও বিরোধ।

পরে এ বিস্তর মানসিক দূরত্বও তৈরি হয় এবং এসব কিছুতে আর্ত সুচতুর রূপে কাজে লাগিয়ে কিছু রাজনৈতিক অভিভাবক সাময়িক মোহগ্রস্ত, পক্ষান্তরে পথভ্রষ্ট, সন্তানের মগজ ধোলাই করতে গিয়ে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেন যে, পিতা-মাতাই হচ্ছেন সমাজের সব চাইতে বড় শ্রেণীর শত্রু। কাজেই যেন-তেন প্রকারে এ শ্রেণীশত্রুদেরকে খতম করাই হবে প্রথম এবং প্রধান কাজ। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। এ অবস্থায় সন্তানদের মানুষ করার ব্যাপারে মায়েরা যদি আর একটু যত্নশীলা, সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহলে আজকের এ জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও সম্ভব। বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনও হবে না। কারণ আজকে যারা যুবক কাল তো তারাই বৃদ্ধ হবেন। একদিনে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমনটা ভাবাই বোকামি। তবে একটু একটু করে একদিন নিশ্চয়ই হবে এমনটা আশা করা যেতেই পারে। আর এ আশা নিয়েই তো আমরা সবাই বেঁচে আছি। নয় কি?

বার্ধক্যে নিঃসঙ্গ জীবন : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে

বার্ধক্যের মধ্যে এক অপার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালামৌ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।' বার্ধক্যের প্রতি সঞ্জীব বাবুর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার নেপথ্য অভিব্যক্তি এ সুন্দর শব্দটি, যা বার্ধক্যকে আরও বিশেষভাবে সুন্দর করেছে। বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিবশতই সঞ্জীববাবু এ কালজয়ী উক্তিটি করেছিলেন। অর্থাৎ সঞ্জীববাবু যে-যুগের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন, সে-যুগের বৃদ্ধরা পরিবারে, সমাজে, জীবনের সর্বস্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করতেন। বৃদ্ধরা নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার ভার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সুরক্ষিত জেনে, সন্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতেন সাধ্যাতীত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। এটি ছিল সনাতন আদর্শের অমোঘ বিধান, অলিখিত নির্দেশ। সেসব দিন আজ অপসৃত।

www.pathagar.com

আজকের বার্ধক্যের কুৎসিত বীভৎস রূপটি আপামর বিশ্ববাসীকে রীতিমতো শঙ্কিত করে তুলেছে। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরা আজ মানবসভ্যতাকে এক কঠিন প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সঞ্জীববাবু যদি আজকের বৃদ্ধদের এ দুরবস্থা দেখে যাবার সুযোগ পেতেন, তাহলে হয়তো তাঁর এ স্মরণীয় উক্তিটির জন্য লজ্জিতই হতেন। মূল্যবোধের শানে বাঁধানো রাস্তায় এলে বার্ধক্যকে এসব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় নি কোনোদিন। আমাদের সনাতন আদর্শের ধর্ম আমাদের বার্ধক্যকে নিশ্চিন্তেই রেখেছিল এতদিন। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এসব সমস্যা দীর্ঘদিনের। আজ যেন সেসব সমস্যার উষ্ণ নিশ্বাস আমাদের সমাজজীবনেও পড়তে শুরু করেছে।

বার্ধক্য মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রকৃতিই মানুষের জীবনের এ অমোঘ পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছে। জীববিজ্ঞান বলে, পঁচিশ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ বিকাশের পর আমাদের সকলের দেহ বার্ধক্যের পথে যাত্রা শুরু করে। দেহ ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। জীবকোষের সংখ্যা কমতে আরম্ভ করে। বয়সের সঙ্গে পেশির ক্ষয় সাধিত হয়। নার্ভ সেলের সংখ্যাও কমতে থাকে। আমাদের রেনের আকার ও ওজন দু'টিই হ্রাস পায়। পঁচাত্তর বছর বয়সে অরিজিনাল ব্রেনের ওজন শতকরা ৫৬ ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি চল্লিশ বছর থেকেই কমতে আরম্ভ করে।

সে-সময়টায় মানুষের জীবনে মানসিক ও শারীরিক উভয় ক্ষেত্রেই আসে নানা পরিবর্তন। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, মানুষ বৃদ্ধ হয় দু'ভাবে : প্রাইমারি এজিং (বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে যে বার্ধক্য আসে) ও সেকেন্ডারি এজিং (অসুখ-বিসুখের ফলে যে বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়)। বার্ধক্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা মানসিক বার্ধক্য, সামাজিক বার্ধক্য এবং বায়োলজিকাল বার্ধক্য। কোনো বার্ধক্যই মানুষের একা আসে না, কোনো না কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না বার্ধক্য কিভাবে সব দিক থেকে মানুষকে এক দুঃসহ অবস্থার আবর্তে ঠেলে দেয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রকে অসহায় করে তোলে। এসব সমস্যায় সমাবৃত হয়ে জীবন হয়ে ওঠে বিড়ম্বিত। দেহকে জরা গ্রাস করার সঙ্গে-সঙ্গে দুর্বলতা গ্রাস করে মানসিক স্থিতাবস্থা।

সংসারের ওপর নিজের সুকঠিন নিয়ন্ত্রণ হতে থাকে শিথিল। আর্থিক সচ্ছলতায় আসে সীমাবদ্ধতা, ফলে পারিবারিক ব্যয় সংকোচন হয়ে ওঠে অনিবার্য। সাংসারিক দায়দায়িত্ব সমাপনান্তে সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার ক্রমে হয় নিঃশেষিত।

www.pathagar.com

অর্থের অপ্রতুলতা ধীরে-ধীরে নিঃস্ব করে জীবনের অনিন্দ্য স্বাদ। সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যে দায়বদ্ধ হলে মানসিক পীড়া কিছুটা লাঘব হয় বটে, অন্যথায় নিজেকে ভবিষতের পায়ে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। সে এক ভয়াবহ সময়, এক অসহনীয় অবস্থা। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ পুনরায় দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে আসে। শিশু যেমন এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে মায়ের সান্নিধ্য ছাড়া অসহায়বোধ করে, বৃদ্ধরাও সে সময়টাতে প্রিয়জন সান্নিধ্য ছাড়া তেমনি অসহায়বোধ করতে থাকেন। বার্ধক্যে প্রয়োজন হয় একান্ত আপনজনের নৈকট্য ও তাদের সহযোগিতা। বার্ধক্যের সনাতন ঐতিহ্য অনুসারেই এসব মূল্যবোধের সাহচর্য পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। এ সাহচর্য, সান্নিধ্য তাকে চেয়ে পেতে হয়নি কোনোদিন। পেয়েছে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অনুসারেই। এ অমূল্য মানসিকতাগুলো এতদিন পাশ্চাত্যের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়েই ছিল। আজ ওরা আমাদের সগোত্রে দীক্ষিত করতে পেরে আনন্দই উপভোগ করে।

আমাদের সমাজ জীবনে এ অবক্ষয় শুরু হয় একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাবার সময় থেকে। লোভ-লালসার যে বীজ দীর্ঘদিন আমাদের মানসিকতার অন্দরমহলে সুপ্ত ছিল, সে বীজ লোভের লালসায় সিক্ত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারের পাষাণ প্রাচীরে অজান্তেই জন্ম দিয়েছিল এক বিষবৃক্ষের। সে বিষবৃক্ষ ধীরে-ধীরে প্রাচীরের গায়ে শিকড় বিস্তার করে তাতে ফাটল ধরায় ও কালক্রমে সে-ফাটল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। একদিন সে বিষবৃক্ষের শিকড় মূল্যবোধের শক্তপোক্ত প্রাচীরটাকেই চৌচির করে ফেলে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে সংসারের এক পকেট সংস্করণের মানসিকতা আমাদের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। সেদিন থেকেই পরিবারে-পরিবারে বৃদ্ধরা অপাঙ্‌ক্তেয় হতে থাকেন। মাতাপিতা পরিবারে আবর্জনার মতো বর্জনীয়। সে মানসিকতার জন্মও সেদিন থেকেই।

এ প্রক্রিয়াটাই আরও দ্রুততর হয় পাশ্চাত্যের হৃদয়হীন সংস্কৃতি সংযোজিত হওয়ার পর। বিশ্বায়নের বিষাক্ত নিশ্বাস আমাদের প্রাচ্যের বার্ধক্যকে আরও জটিল আবর্তের মধ্যে ঠেলে দেয়। হৃদয়হীনতাই যে-সংস্কৃতির মূল তথ্য, সে-তথ্যের বাজারজাতকরণে খুব একটা সময় ব্যয় করতে হয়নি আমাদের। পাশ্চাত্যের এ উচ্ছিষ্ট মানসিকতা তিলে তিলে গ্রাস করতে থাকে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর) তাঁর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' নামক ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থখানিতে পাশ্চাত্যের বার্ধক্য সম্পর্কে

www.pathagar.com

তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ নানা মর্মান্তিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সে-দেশের সন্তানদের তাঁদের পিতা-মাতার প্রতি কতটুকু নিষ্ঠুরতার মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে পুস্তকটির অনেকগুলো পাতা জুড়ে। তারা সমাজে আবর্জনা বিশেষ। তাঁদের দাবি অফুরন্ত। কিন্তু সমাজকে দেবার ক্ষমতা নেই কানাকড়ি। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের বিচার করে উৎপাদনের নিরিখে। হৃদয়ের সেখানে কোনও স্থান নেই। তাদের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ আর বেতো ঘোড়ার মধ্যে কোনও ফারাক নেই। বেতো ঘোড়ার কাজের ক্ষমতা নেই কিন্তু আহার জোগাতে হয় আমৃত্যু। বৃদ্ধদের বেলাতেও তাই খাটে, সে বাবা-মা যে-ই হোক-না-কেন। এতটাই তাদের নিষ্ঠুর মানসিকতা। ওরা বলে, যাদের কাজ করার ক্ষমতা কমে গিয়েছে, কথা বলার ইচ্ছা বেড়ে গেছে, তাদের উপর নির্ভর করলে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। যৌবনের উদ্ভাবনী শক্তি ও পেশি শক্তিতেই সমাজ এগিয়ে চলে।

পাশ্চাত্যের উদ্ধত যৌবন বার্ধক্যের প্রতি এতটাই নির্মম যে তারা বলে, দরিদ্র দেশগুলোতেই শুধু বৃদ্ধদের সম্মান বেশি। সেসব দেশে শিল্পের প্রগতি তেমন দ্রুত নয় বলে বৃদ্ধরা রাতারাতি কাজকর্মের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন না, অথচ পশ্চিমে বিজ্ঞানের এমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা বুড়োদের পক্ষে বেশ কষ্টকর।

প্রতিযোগিতার দৌড়ে বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার, বৃদ্ধ কারিগর সবাইকে পথ ছেড়ে দিতে হয় নতুনদের। তার ফলেই একজন মানুষ জীবদ্দশায় গরুর গাড়ি থেকে মহাকাশচারী রকেটের বিবর্তন দেখে যেতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া শিল্প-সভ্যতায় এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা এত কঠিন যে অন্যের দিকে তাকানোর সময় থাকে না। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সামলানোই যথেষ্ট কাজ। তার উপর বাবা-মা ঘাড়ে চাপলে জীবনে আনন্দ বলে কিছু থাকে না। সুতরাং যে যার ঘর সামলাও। তবেই প্রগতির রথ এগিয়ে চলবে।

মতবাদ হিসাবে যুক্তিগুলো মন্দ নয়। প্রগতির এটাই হয়তো শর্টকার্ট রাস্তা। কিন্তু যে প্রগতিতে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোনও স্থান নেই, স্থান নেই স্বজন-সুহৃদদের, স্থান নেই মায়া-মমতার মতো মানবিক বৃত্তিগুলোর, সে-প্রগতি কাদের জন্য? প্রগতির জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য প্রগতি? প্রশ্নটা নিয়ে আজ না হোক কাল মানুষকেই ভাবতেই হবে। সে-প্রগতি পাশ্চাত্যের হৃদয়হীন প্রগতিবাদীদের কাম্য হলেও, আমাদেরও কি কাম্য? প্রশ্নটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

www.pathagar.com

প্রগতির প্রতি আমাদের কোনও ছুঁতমার্গ নেই। আমরাও তো আমাদের সন্তানদের জগতের এ আনন্দযজ্ঞে অংশীদার করাতে চাই। আমরাও চাই আমাদের সন্তানরাও একদিন আলোর ঠিকানায় পৌঁছে উপভোগ করুক জীবনের অনিন্দ্য স্বাদ, যে-স্বাদ সুখের, সমৃদ্ধির, কল্যাণের। কিন্তু সে-প্রগতিকে আমরা কি মেনে নিতে পারি যে-প্রগতির রথের চাকা যাত্রাপথে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মমভাবে পিষে দিয়ে যাবে? খুন করবে আমাদের বার্ধক্যকে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে? আমরা এগিয়ে যাওয়া পরিপন্থীও নই কিন্তু তাই বলে মানবিক গুণগুলোকে মাড়িয়ে যাবার মতো উদারপন্থীও নিশ্চয় আমরা নই।

এ তথ্যটাই এতদিন প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটা মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। বৃদ্ধদের মতবাদও আজ জরাগ্রস্ত, কাজেই সে সব মতবাদকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের প্রগতির সূত্র অনুসরণ করেই আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছে, সে আলোর নিচে রয়েছে ঘনঘোর অন্ধকার—সে অন্ধকারে কত বীভৎস জীবননাট্য অভিনীত হচ্ছে তার প্রকৃত সংবাদ আমরা অনেকেই রাখি না। যা কিছু চকচক করে তাই সবসময় সোনা হয় না। সেসব দেশে প্রগতির ঘোড়া দুর্দমনীয় বেগে ছুটে চলেছে। অন্যদিকে সৃষ্টি করে চলেছে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। দিনের পর দিন সে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমস্যার সূতিকাগারে এক সমস্যা অন্য সমস্যার জন্ম দিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।

পশ্চিমের দেশগুলোতে যাদের বয়স ৬৫ বছরের উপর তাদেরই বৃদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়। 'সিনিয়র সিটেজেন'-এ ছেলে ভোলানো সম্মাননা আজকাল আমাদের দেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু হয়েছে। সেসব দেশে হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন বৃদ্ধ অর্থাৎ তাদের বয়স ৬৫ বছরের উপর, কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে দেশের একটা বিরাট অংশ আজ বার্ধক্যের কবলে। সে হারে প্রতি বছর আরও নতুন সদস্য সংযোজিত হচ্ছে। সে বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধকে নিয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলো আজ হিমশিম খাচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদরা বার্ধক্যের এ ভয়াবহ সমস্যার সামাজিক সমাধান খুঁজে জীবনপাত করে চলেছেন, ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। সমাধান সূত্র আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পশ্চিমের শিল্পবিপ্লব যে শুধু বার্ধক্যের অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে তাই নয়, সামাজিক পরিকাঠামোটাই ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এ বিবেকহীন বিপ্লবের

www.pathagar.com

পথে চলে সমস্যার মূলে ওরা কোনোদিনই পৌঁছোতে পারবে না। কেবল সৃষ্টি হবে নতুন নতুন হোম বা বৃদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধদের গিনিগিপ করে প্রতিনিয়ত চলবে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। উঠে আসবে নতুন নতুন তথ্য। সবকিছুর যোগফল দাঁড়াবে শূন্য।

পশ্চিমাদের এ হোম বা নির্বাসন কেন্দ্রগুলোর সত্যিকারের চেহারাটা কি তা একবার দেখা যাক। প্রতিটা হোমে জরাগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত অথর্ব মানুষগুলো মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছেন। সমাজে ওরা চূড়ান্তভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত। সে দেশের যৌবন এসব বৃদ্ধ মানুষদের সম্মান দিতে রাজি নয়। পরিবর্তে চলে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন। বার্ধক্যের প্রতি ওরা শুধু নিষ্ঠুরই নয়, হিংস্রও বটে। সর্বক্ষণ ওরা বৃদ্ধদের মৃত্যু কামনাই করে। বৃদ্ধ শব্দটা সেসব দেশে গালাগালের নতুন সংযোজিত একটি প্রতিশব্দ মাত্র।

সন্তানদের ক্রমাগত অবহেলা, প্রতিটি বৃদ্ধের জীবনকে করে তোলে বিতৃষ্ণ, বিবর্ণ। অপমান, অবহেলা সহ্য করতে হয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস। এসব নিয়েও বেঁচে থাকতে হয়, মৃত্যু আসে না বলে। এর চেয়ে দুঃখদায়ক বাঁচা কিছু হতে পারে কি?

অথচ এসব বৃদ্ধদের একদিন সমাজে ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ, কেউ ছিলেন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, কেউবা দার্শনিক, জজ, অর্থনীতির পণ্ডিত, কেউবা মিলিটারির বড় অফিসার আবার কেউ সেনেটর। আজ জরাগ্রস্ত তাদেরকে দেহমন নিয়ে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছে। পুত্র-কন্যারা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কেউ বাবা-মার খোঁজ নেবার প্রয়োজন অনুভব করে না। কোনও দায়বদ্ধতা নেই, মায়া-মমতার প্রশ্ন তো আসেই না।

কিছু সংখ্যক বৃদ্ধ সরকারের আনুকূল্যে জীবন কাটালেও সকলেই আর্থিক দিক থেকে তেমন সচ্ছল নন। অর্থ সব সময় জীবনের সব চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। প্রয়োজন হয় আপনজনদের। আপনজনের সান্নিধ্য ছাড়া জীবনের বিশেষ করে শেষ জীবনের সব প্রয়োজন মেটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সকলেই প্রায় অক্ষম। কেউবা বাতব্যাধিতে অচল, কারও দৃষ্টি ক্ষীণ, কেউবা বধির, শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন বহুদিন, কেউবা আলজাইমার্সে আক্রান্ত, আবার কেউবা বার্ধক্যজনিত অন্য কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে চলতশক্তি রহিত। নিজেদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। ঔষধ-পথ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের সব থেকেও আজ কিছু নেই। তদুপরি

www.pathagar.com

একাকিত্ব মানুষকে আরও অসহায় করে তোলে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হয় তাদের।

সেসব দেশের মানুষ বার্ধক্যকে বড় ভয় পায়। তাই ওরা সহজে বৃদ্ধ হতে চায় না। যৌবনকে ধরে রাখবার জন্য তাদের চেষ্টায় অন্ত নেই। প্রসাধনের প্রলেপ প্রায়শই বার্ধক্যের বলিরেখাকে আরও প্রকট করে তোলে। কখনও সে চেষ্টা হাস্যকর পর্যায়ও চলে যায়।

বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেন। কেউ আসে না, হতাশায় হতাশায় বুকের পাঁজরে গভীর ক্ষতের জন্ম হয়, প্রায়শই সে ক্ষতে রক্তক্ষরণ হয়। দীর্ঘদিনের হতাশা জন্ম দেয় মানসিক অবসাদ। অনেক সময় মানসিক বিকৃতির লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেসব দেশে প্রকাশ্যে চোখের পানি ফেলা অসভ্যতা। তাই সভ্যতার ভান করে নিজেদের নিঃশেষ করতে হয় নিঃশব্দে। ফাইন, গ্রেট, গ্লোরিয়াস, বিউটিফুল বা থ্যাংকস এসব সভ্যতার শব্দগুলোর সাহায্যে নিজেকে আড়াল করতে হয় প্রতিনিয়ত।

দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন সহ্য করে একদিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কেউ কেউ ডা. ডেথ-এর শরণাপন্ন হন। মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ 'ডক্টর ডেথ'-এর শিরোনামে লন্ডনের একটা দৈনিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ডক্টর হ্যারল্ড শিপম্যান নামের এক নরঘাতক লন্ডনে বহু বৃদ্ধকে করুণা-মৃত্যু উপহার দিয়েছিলেন। অর্থাৎ উভয়ের সম্মতিক্রমে রোগীকে বিষ মেশানো ইনজেকশন প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ডক্টর শিপম্যান ঠিক কত জনকে এভাবে 'করুণা মৃত্যু' বা হত্যা উপহার দিয়েছিলেন তা সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও গোয়েন্দা রিপোর্টানুসারে দীর্ঘ ৩০ বছরের থেকে চিকিৎসক জীবনে সক্রিয় সহযোগিতায় করুণা মৃত্যু ঘটানোর সংখ্যা দেড় হাজারের কম নয়। যাদের সংসার, ভোগবাসনা চলে গেছে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, পরিবারে অনাদর অবহেলার শিকার হয়ে জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ, তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করাই ছিল ডক্টর শিপম্যানের কাজ। 'ডাঃ ডেথ' অভিধায় ভূষিত আর একজন করুণা মৃত্যুর রূপকার ডাঃ জ্যাক কেভরকিয়ান। তাঁর হাতে 'করুণা মৃত্যু' প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। শেষ পর্যন্ত ডা. শিপম্যান কারাকক্ষে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আর সিরিয়াল কিলার জ্যাক কেভরকিয়ান, ২৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এ করুণা মৃত্যু বা 'ইউথ্যাননাসিয়া' নিয়ে একটা বিতর্ক কিন্তু রয়েই গেছে।

www.pathagar.com

কাজেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, কী অসহনীয় অবস্থায় পড়লে মানুষ এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পাশ্চাত্যের হৃদয়হীন শিল্প বিপ্লব সেসব দেশের বৃদ্ধদের প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আজ যারা প্রগতির অগ্রদূত, শৌর্যবীর্যে সম্মানে প্রতিপত্তিতে সমাজ চূড়ামণি, কাল কিন্তু তারাও পুরোনো হয়ে আবর্জনার মতো নিক্ষিপ্ত হবে যথাস্থানে। যাঁরা প্রগতির প্রবাদ পুরুষদের জন্ম দিয়েছেন মাত্র ক'দিন আগে স্নেহ মায়া মমতায়, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় বড় করেছেন তিলে তিলে, রোগশয্যায় শিয়রে বসে হাত বুলিয়েছেন সন্তানের সর্বাঙ্গে। কল্যাণ কামনায় যিশুর কাছে করুণা ভিক্ষা করেছেন কায়মনোবাক্যে। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে তৈরি করেছেন প্রগতির অগ্রদূতদের, তাঁরাই আজ সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, উপেক্ষিত হয়ে আবর্জনার মতো অন্তিম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছেন। কি মর্মান্তিক। এরই নাম প্রগতি? আমরা যদি এখনও পাশ্চাত্যমুখী সর্বনাশা চিন্তাধারার মোহমুক্ত হতে না পারি, সেদিন সুদূর নয়, যেদিন ডাঃ ডেথই হয়ত আমাদের তুলে দেবেন মেষ পারা নির কড়ি।

নেপালের নারায়ণহিতি : রাজা বিহীন রাজপ্রাসাদ

১১ জুন ২০০৮। এ দিনটিতে নেপালি রাজতন্ত্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশীয় নানা সংঘাতের সাক্ষী নারায়ণহিতি রাজদরবার সম্পূর্ণরূপে নেপালি জনগণের কব্জায় চলে এসেছে। নারায়ণহিতি প্রাসাদ আর রাজার সম্পত্তি হিসেবে রইল না, এখন থেকে তা দেশের সম্পত্তি, জনতার সম্পত্তি। বস্তুত মাওপন্থী নেতা প্রচণ্ডের অসমনীয়তার কাছে হার মেনে রাজতন্ত্রকে বিসর্জন দিলো নেপাল, এলো গণতন্ত্র। তবে ১১ জুন তা কার্যকর হলেও তার আগে ২৯ মে তারিখে সব ধরনের রাজকীয় মর্যাদা অপসৃত হয়েছিল নারায়ণহিতির রাজপ্রাসাদ থেকে। সরিয়ে ফেলা হয়েছিল রাজতন্ত্রের সব প্রতীক। সেদিন থেকে নারায়ণহিতিতে সগৌরবে উড়তে শুরু করেছিল গণতান্ত্রিক নেপালের পতাকা।

নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদের একটি অংশ বস্তুত দু'শো বছরের অধিক পুরোনো। এ নামটির পেছনে আছে আসলে একটি বড়সড় পুকুর। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নারায়ণহিতি নামে এ পুকুরটির নামে পরে রাজপ্রাসাদটির পরিচিতি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নেপালের শাহ বংশের

www.pathagar.com

তৎকালীন রাজা তাদের পুরোনো রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে প্রবেশ করেন নতুন করে নির্মিত নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদে। তার আগে রাজবংশের সঙ্গে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল শাহ বংশের। বহু বছরের লাগাতার যুদ্ধের পর অবশেষে জয়ী হন শাহরা। এরপর তারা রাজপ্রাসাদ পাল্টে নারায়ণহিতিতে এসে প্রবেশ করেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ রাজপ্রাসাদের সংস্কার ও পরিমার্জন চলতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। বর্তমান নারায়ণহিতির যে রূপটি আমরা দেখতে পাই তা পুনঃনির্মাণ করা হয় ১৯৭০ সালে। সে বছর রাণী ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিবাহ পাশে আবদ্ধ হন তৎকালীন নেপালরাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ। এ বিয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে নারায়ণহিতির নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়।

ষোড়শ শতকে নেপালে রাজতন্ত্রের অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। শাহ রাজ বংশের বংশধররা এ রাজতন্ত্রে বীজটিকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তারা নেপালের শক্তিশালী এক রাজতন্ত্রের পত্তন করেছিলেন। এ রাজবংশের পূর্বসূরি যশোব্রক্ষ কাসকি অঞ্চল অধিকার করে শাসন করতে শুরু করেন। এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুবাদে তৎকালীন মোঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের কাছ থেকে তিনি শাহ উপাধি পান, যা এতকাল পর্যন্ত অটুট ছিল। ষোড়শ শতকের শেষ বছর, অর্থাৎ ১৫৯৯ সালে এ ভূখণ্ডে গোর্খা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোর্খা সাম্রাজ্য ছিল বর্তমান নেপালের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ড, একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যশোব্রক্ষের ছেলে দিব্য শাহ। ১৫৭০ সালে রাজা দিব্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বস্তুত তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যলোভী এক হানাদার রাজা। আশপাশের বেশ কয়েকটি ছোট প্রদেশকে পদানত করে তিনি গোর্খা সাম্রাজ্যের পরিসর বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিব্যের পরের রাজারা গোর্খা সাম্রাজ্যকে এভাবে অনেকখানি বিস্তৃত করেন। ফলে গোর্খা রাজ্য একটি বড়সড় চেহারা পায়। ১৭৪৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন পৃথ্বি নারায়ণ সিংহ শাহ। তিনি কাসকি, গোর্খা ও নেপালকে এক করে নেপাল সাম্রাজ্যের পত্তন করে সমগ্র নেপালের রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৫ সালের গোর্খা যুদ্ধের সময় নেপালে পা রাখে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা করার নামে নেপালের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ে রাজাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে। ১৮১৬ সালে এক ভয়ানক যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেপালের মোট ভূখণ্ডে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করে ফেলে। নেপালকে স্বায়ত্বশাসনের বিনিময়ে তারা নেপালের কাছ থেকে নিয়ে নেয় সিকিম ও তরাই অঞ্চলের খবরদারি। উনিশ

www.pathagar.com

শতকের মধ্যভাগে শাহ রাজবংশকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয় এবং রানারা ফের জোরদার হয়ে ওঠে, তারা নেপালের ক্ষমতা দখল করেন। রানারা নেপালের রাজাকে পরিণত করেন এক ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপ্রধানে। নামকে ওয়াস্তে রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রী পদে বসে রানারা নেপাল শাসন করতে শুরু করেন। অর্থাৎ রাজা নন, দেশের প্রধান হন প্রধানমন্ত্রী। রানারা এভাবে শাসনকার্য কব্জা করে ফেলায় অপমানিত রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ নেপালের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় রানারা ক্ষমতাসীন রাজা হিসেবে রাজার আসনে জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহকে বসান। ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ ১৯৫০ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। রানা রাজবংশের শেষ প্রধানমন্ত্রী মোহন শমসের বাহাদুর রানা পদত্যাগ করার পর শাহ রাজবংশের উত্তরসূরিরা রাজাকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী করে পুনরায় আগের শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহের পর সিংহাসনে আরোহণকারী মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের মৃত্যু হয় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি। এরপর বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ নেপালের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৯০ সালে রাজা বীরেন্দ্র নেপালের জনগণকে রাজতন্ত্রের সমান্তরালভাবে গণতন্ত্রের স্বাদ দেবার জন্য যুগান্তর সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নেপালকে পরিণত করেন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে।

এরপর আসে সে ভয়াবহ, নারকীয় রাত। শুধু নেপালের নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদের ক্ষেত্রে নয়, বস্তুত নেপালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিন হিসেবে চিহ্নিত হয় ২০০১ সালের ১ জুন তারিখটি। সেদিন রাতে নেপালের পরবর্তী রাজা তথা যুবরাজ দীপেন্দ্র নৃশংসভাবে খুন করেন নেপালরাজ তথা তার পিতা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ, মহারানী তথা তার মা ঐশ্বর্যসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে। এরপর নিজেও আত্মঘাতি হবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এখনো অনেকেরই সন্দেহ, বর্তমান রাজা জ্ঞানেন্দ্রর ছেলে রাজকুমার পরশ এ হত্যাকাণ্ডের আসল নায়ক। যা হোক না কেন, রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত যুবরাজ দীপেন্দ্রকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে নিজেই ক্ষমতা দখল করেন বীরেন্দ্র ভাই তথা দীপেন্দ্রর কাকা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ। ২০০১ সালের ৪ জুন দীপেন্দ্রর মৃত্যুর পর নিজেকে নেপালেশ্বর ঘোষণা করেন জ্ঞানেন্দ্র এবং নেপালে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সূচনা হয়। জ্ঞানেন্দ্র শুরু করেন স্বৈরাচার। তিনি প্রজাদের দাদার দেয়া সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি কোনোদিন ভালো চোখে দেখেন নি। ক্ষমতায় বসে সাংবিধানিক সমস্ত অধিকার

www.pathagar.com

খর্ব করে ফের রাজতান্ত্রিক নেপালে ফিরে যাবার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ২০০৫ সালে তিনি সংসদ ভেঙে দেন। ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রীসভাহীন সরকারের শাসন ক্ষমতার পুরোটি কব্জা করেন জ্ঞানেন্দ্র। অবশ্য ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে এ স্বৈরাচারী শাসনের যবনিকা পড়ে। এরপর ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাংবিধানিক সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আরম্ভ হয় নেপালের রাজতন্ত্র তথা শাহ বংশের শাসনের পতনকাল। ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, ২০০৮ সালের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর নেপালের রাজতন্ত্রকে চিরতরে বিলুপ্ত করা হবে এবং পত্তন হবে গণতান্ত্রিক নেপালের। ২০০৮ সালের ২৮ মে নেপালকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক গণরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সে সঙ্গে বিশ্বের সর্বশেষ হিন্দু রাজতন্ত্রের বিলপ্তি ঘটে। একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রটি চলে যায় ইতিহাসের পাতায়। কেননা নেপাল আর সরকারিভাবে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, তা এখন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

এরপর প্রশ্ন উঠল যদি রাজবংশ এবং রাজতন্ত্র না থাকে তাহলে এত বিশাল এক রাজপ্রাসাদ থাকার মানে কি? প্রশ্নটা তুললেন মাওবাদী প্রধান প্রচণ্ড। ফলে প্রচণ্ডের দাবি অনুযায়ী ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে নেপাল সরকার প্রাসাদটি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছিল এক অর্ডিন্যান্স জারি করে। এ অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছিল, যতদিন না নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ তার পরিবারবর্গ নিয়ে নারায়ণহিতিতে থাকতে পারবেন কিন্তু তারপর সসম্মানে তাকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যেতে হবে। সরকারি সিদ্ধান্তের একদিন পর জ্ঞানেন্দ্র রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেও তিনি আবার নারায়ণহিতিতে ফিরে আসেন। তখন অনুমান করা গিয়েছিল তিনি ডানপন্থী নেতাদের সঙ্গে কোনো ফন্দি আঁটছেন। সব ঠিকঠাক চলত কিন্তু ২০০৮ সালের ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মাওবাদীরা ব্যাপক হারে জিতে যাওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী গিরিজাপ্রসাদ কৈরালাকে অধীনে আনতে পারলেও প্রচণ্ডও তার অনুগত মাওবাদীদের কিছুতে পটাতে পারেন নি। বরং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর প্রখ্যাত বামনেতা পিসি গাজুরেল স্পষ্ট করে বলে দেন, 'রাজা ও তার পরিবারের সদস্যরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করুন, নইলে বল প্রয়োগ করা হবে।' এদিকে মাওবাদী মন্ত্রী হিসিলা ইয়ামিও জানিয়ে দেন, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণহিতি ছাড়লেই সরকার সেটাকে জাদুঘর বানানোর কাজ শুরু করবে।

www.pathagar.com

২০০৮ সালের ২৮ মে নেপালকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার দিনই মাওবাদীরা জ্ঞানেন্দ্রকে নারায়ণহিতি ছাড়ার পনেরো দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন। ১১ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে রাজা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ ও তার পত্নী আনুষ্ঠানিকভাবে নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। এমন কি রাজা জ্ঞানেন্দ্র তার রাজমুকুট ও স্বর্ণালংকারগুলোকে বাধ্য হয়ে সরকারের কোষাগারে দান করেন। সরকার জ্ঞানেন্দ্রের প্রস্থানের পর নারায়ণহিতি থেকে সমস্ত রাজকীয় প্রতীক তুলে ফেলে তাতে গণতন্ত্রের মোহর লাগিয়ে দেয়। নারায়ণহিতি প্রবেশ করে এক স্বর্ণযুগে, যার নাম গণতন্ত্র, যার নাম প্রজাতন্ত্র। গণতন্ত্রের পতাকা শীর্ষে নিয়ে নতুন পরিচয়ে তাই জেগে ওঠে জনতার নারায়ণহিতি প্রাসাদ, যার সঙ্গে 'রাজ' শব্দটির কোন সম্পর্ক থাকল না।

উষ্ণায়ন ও বায়ু দূষণের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া

বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার পরিবর্তন বহু চিন্তাশীল মানুষকেই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে এবং একই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের এ সবুজ গ্রহটি নিয়ে এখন শুধু বিজ্ঞানীরাই নন, সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটিকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন গুরুতর। আবহাওয়ার এ পরিবর্তনের ফলেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমেই ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে। গত ১৩০ বছরের আবহাওয়ার খবর নিতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেছে, এ সময়কালের উষ্ণতম দশটি বছর হলো ১৯৮০ থেকে ১৯৯০। এর মধ্যে গড় উষ্ণতম বছরটি ছিল ১৯৯৫।

পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পানির উষ্ণতাও বেড়ে যায়। এর ফলে বায়ুস্তরে বেশি পরিমাণে সমুদ্র থেকে বাষ্পশক্তি সঞ্চিত হতে থাকে এবং তীব্র ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালে ঝড়ের বেগ ও ধ্বংস ক্ষমতা কতটা বেড়েছে সেটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে। এ ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৭০ কিলোমিটার। এর ফলে দশ লক্ষাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল এবং মৃত্যু ঘটেছিল ১,৩৯,০০০ মানুষের। ১৯৯২ সালের আগস্টে হারিকেন এন্ড আছড়ে পড়েছিল ফ্লোরিডার ওপর। এর গতিবেগ

www.pathagar.com

ছিল ঘণ্টায় ২৩৫ কিলোমিটার। এই হারিকেন ৮৫,০০০ ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে গৃহহীন করেছিল। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল পঁচিশ বিলিয়ন ডলার বা পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। ঝড়ের ইতিহাসে এটিকেই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইউরোপ ও আমাদের দেশও বেশ কয়েকবার এ ধরনের মারাত্মক ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে।

১৯৯৫ সালে বিশ্বে উষ্ণতা বাড়ার প্রাকৃতিক কোনো কারণ ছিল না। প্রতি চার বছর অন্তর প্রশান্ত মহাসাগরে যে প্রচণ্ড ঝড় এল নিনোর উৎপত্তি হয় সেবার এটিও ছিল না এবং সৌর তাপ বৃদ্ধির যে আবর্ত সেটিও ছিল নিম্নতম স্থানে। তবুও দেখা গেল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকেই বিজ্ঞানীদের ধারণা দৃঢ় হলো যে, পৃথিবীর আবহাওয়ার এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী বায়ুস্তরে সঞ্চিত হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাস যা মানুষের বিবিধ কর্মধারার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে।

গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে বাষ্প, সূক্ষ্ম ধূলিকণার সঙ্গে রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। ভূপৃষ্ঠ থেকে যে তাপ বিকিরিত হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে তার অনেকটাই শোষণ করে নেয় এসব গ্যাস। এভাবে পৃথিবীর বায়মণ্ডলে এগুলোর দ্বারা তাপ সঞ্চিত হয় যা মহাকাশে না গিয়ে সঞ্চিত হতে থাকে এবং এর ফলেই তাপ বাড়তে থাকে। এসব গ্যাসের দ্বারা সঞ্চিত তাপের প্রতিক্রিয়াতেই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটিকেই গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বা গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয়। প্রধানত বায়ুমণ্ডলে যত বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমবে ততই বেশি তাপ সঞ্চিত হতে থাকবে। খনিজ, জৈব জ্বালানি যত বেশি পোড়ানো হবে তত বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হবে। এর ফলে আবহাওয়ার তাপমাত্রাও বাড়বে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের সময় বায়ুমণ্ডলের যে তাপমাত্রা ছিল বর্তমানে সে তাপমাত্রা দশমিক ছয় ডিগ্রি বেড়েছে। আর এরই ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি। শুরু হয়েছে উভয় গোলার্ধের মেরু অঞ্চলের বরফ গলা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ধীরগতিতে বেড়ে চলেছে এবং এভাবে চলতে থাকলে আগামী চার-পাঁচ দশকের মধ্যে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলগুলোই শুধু পানির নিচে তলিয়ে যাবে না, এর সঙ্গে বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জও সমুদ্রগর্ভে বিলীন হবে। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন তখন আছড়ে পড়বে স্থলভাগের ওপর, ফসল উৎপাদন

www.pathagar.com

দারুণভাবে ব্যাহত হবে, পৃথিবীর বুকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসবে। এককথায় সেসময় বড়ই ভয়ঙ্কর। কারণ শুধু মানুষ নয়, সমগ্র প্রাণীকুলেরই নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে।

বিষয়টি কল্প-বিজ্ঞানীদের কাহিনী নয়। চূড়ান্ত এ বাস্তবের দিকেই আমরা ছুটে যাচ্ছি কোনো ধরনের চিন্তা না করেই। তবে রক্ষা এটাই যে, বিশ্বের সব মানুষই লোভ-লালসার দাস নয়, কল্যাণচিন্তাও অনেকের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সে কল্যাণচিন্তা থেকে প্রথমেই বিজ্ঞানীরা এ ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং পরবর্তীতে কিছু চিন্তাশীল মানুষ বিজ্ঞানীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলায় ব্রতী হয়েছেন।

আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কীয় আন্তঃসরকারি প্যানেল জানিয়েছেন, ১৯৯০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতা গড়ে ১.৪ ডিগ্রি থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। সেজন্যই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনা নিতান্ত জরুরি হওয়ায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের কিয়োটা শহরে বিশ্বের ১৬৪ দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে বিশ্বের সরকারগুলোকেও দু'টি ভাগে ভাগ করে (উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ) মোট কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন ৫৫ শতাংশ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উন্নত দেশগুলোর জন্য এটি বাধ্যতামূলক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা বুঝে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়। দেশগুলো এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সে চুক্তির নামই কিয়োটা প্রটোকল। স্থির হয় ২০০৮ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলো ১৯৯০ সালের তুলনায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কম করেও পাঁচ শতাংশ কমিয়ে আনবে। বলাবাহুল্য, এ উন্নত দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে ছাড়ছে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, আমেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশ এ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে ২০০১ সালে জার্মানির বন শহরে বিশ্বের ১৮টি দেশের পরিবেশ মন্ত্রীরা এক বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু বন বৈঠকেও কিয়োটা চুক্তি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রেও আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলো নানা ধরনের ওজর আপত্তি তোলে এবং পরোক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঘাড়ে দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তারা কল-কারখানাগুলোর

www.pathagar.com

যন্ত্রপাতি বদলে নতুন ধরনের কম গ্যাস নির্গত হয় এ ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসাবারও প্রস্তাব রাখে। নিজেদের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কলকারখানায় নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার এ প্রস্তাবের পেছনে অবশ্য তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। কারণ শিল্পোন্নত দেশগুলোতেই এ ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ হয়ে থাকে এবং সেগুলো উচ্চমূল্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বিক্রি করার সুযোগ নিতে চাইছে উন্নত দেশগুলো। ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের কল্যাণকর চিন্তাটি এখন পর্যন্ত বাস্তবে রূপ গ্রহণ করেনি।

অথচ উদ্বেগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে এবং এভাবে চললে আগামী ৮০ বছরের মধ্যে মেরুঅঞ্চলের সব বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগকে জলমগ্ন করবে। অবশ্য আবহাওয়ার এ পরিবর্তন রোধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কল-কারখানায় ধোঁয়া নির্গমন রোধ, যানবাহন থেকে এ বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ অনুকূল বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়েও দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন। বন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। পরিবর্তে বায়ুতে অক্সিজেন ছাড়ে। কিন্তু মানুষের লোভের মুখে বন-জঙ্গল-অরণ্য খুব দ্রুত হারে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। এটির পরিণতিতে বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড যে পরিমাণে শোষিত হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। সুতরাং যেকোনোভাবেই হোক গাছপালা বৃদ্ধি ও বনভূমি সংরক্ষণ না করতে পারলে শুধু কল-কারখানায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগিয়ে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব নয়।

কিয়োটা ও বন সম্মেলনে সাফল্য না আসায় সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীকুলের ওপরও ভয়ঙ্কর বিপদকে ডেকে আনা হচ্ছে। এ স্থিতাবস্থা দূর করে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধে যাতে সবাই মিলিতভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসে এ উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তি, পরিবেশবিদ, রাজনীতিবিদ, পরিবেশ কর্মী ও কিছু কিছু দেশের সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি মিলিত হয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। সেখানেও তেমন কিছু হয়নি।

এদিকে, মানুষ এবং জীব-জন্তুর সৃষ্টির দিন থেকেই এ পৃথিবীতে সূর্যের কিরণ সঠিকভাবে পড়ছিল। জীবের প্রাণস্বরূপ বায়ুও সঠিক পরিমাণে ছিল।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই এ দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সভ্যতার প্রগতি এবং মানুষের প্রকৃতিকে জয় করার শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির এবং মানুষের প্রকৃতিকে জ্ঞান এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বায়ুমণ্ডলকে পূর্বের ন্যায় বিশুদ্ধ রাখেনি। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতির উপর হাত দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে এবং সঙ্গে প্রাণীর প্রাণবায়ুকে দূষিত করছে। এখন সমগ্র বিশ্বের বায়ুমণ্ডল এত দূষিত যে, পূর্বের অদূষণ অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে মানবজাতিকে সচেষ্ট না হলে আগামী কুড়ি বছরের পর আমাদের এরূপ রস গন্ধে ভরপুর পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এক পরিসংখ্যান মতে আমেরিকার কল-কারখানাগুলো বছরে ২ লাখ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৯ লাখ টন সালফার ডাই-অক্সাইড, ৩ লাখ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড, ১ লাখ টন হাইড্রো-কার্বন এবং ৩ লাখ টন অন্যান্য অপজাত দ্রব্য বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। সে দেশের প্রায় ১০ কোটি মোটর গাড়ির বছরে ৬ কোটি টন কার্বন-মনোক্সাইড, ১ লাখ টন সালফার ডাই-অক্সাইড, ৬ লাখ টন নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং ১২ লাখ টন অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায়।

কল-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় প্রায় ৫ হাজারের মতো বিষাক্ত পদার্থ আছে। ঢাকার বায়ুমণ্ডলে এরকম প্রায় শত ধরনের বিষাক্ত পদার্থ আছে। বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন মতে, ঢাকা এবং আশপাশ এলাকার বায়ুতে ৬ টন ধূলিকণা, ১১৫ টন সালফার-অক্সাইড, ৪৫০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ৭৫ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং ১৫০ টনের মতো হাইড্রো-কার্বন মিশে আছে। এছাড়াও অন্যান্য আরো ধূলিকণা আছে। এতসব নিয়ে মহানগরীতে বসবাসকারী লোকদের হাত-পা হৃৎপিণ্ড ভালোভাবে কাজ করবে কি? ঢাকায় মাত্র দু'দিন চলাফেরা করে একজন বিদেশী বিজ্ঞানী পর্যটক বলেছিলেন, ঢাকা দেখে মনে হলো যে, সৃষ্টিকর্তার এ পৃথিবীতে বায়ুরও মূল্য আছে। শুধু ঢাকা কেন, সারাদেশের কোনো শহরেই বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়ার স্থান প্রায় নেই।

বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, বরিশালের কথাও উল্লেখযোগ্য। এসব শহর ও শহরতলীতে ছোট-বড়, কল-কারখানা, ইটের ভাটা শোধনাগার ইত্যাদি আছে। এসব থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া উপরে বায়ুকে মারাত্মভাবে দূষিত করছে। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের খনন কাজ শুধু পানিকেই নয়, নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলকেও দূষিত করছে। কোনো কোনো জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস সবসময় জ্বলে থাকার ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা

www.pathagar.com

বাড়ছে। এর ফলে কৃষিকাজে বিঘ্ন ঘটছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এদিকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত সার-কারখানার সালফার এবং এমোনিয়া মিশে বাতাসকে দূষিত করছে।

বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ক্রমাগত বনাঞ্চল উজাড়। অস্বাভাবিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সচেতনতার অভাব এবং বনাঞ্চল সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের অভাব। এছাড়া আইন প্রয়োগে কঠোরতা অবলম্বন না করা এবং লাগামহীন দুর্নীতিই বনাঞ্চল উজাড়ের মূল কারণ। বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অরণ্যরাজি ধ্বংসের ফলে মাটির স্বাভাবিক গঠন প্রকৃতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে বায়ুমণ্ডলে অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে অনিষ্টকারী আরও দু'টি হলো রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক দ্রব্য। পৃথিবীতে রাসায়নিক সারের উৎপাদন প্রতিবছর বেড়েই চলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিডিটি এবং অন্যান্য কীটনাশক দ্রব্য পানি ও বাতাসকে বিষাক্ত করছে। এ দ্রব্যগুলো অপরিকল্পিতভাবে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে বায়ু দূষিত হয় এবং ফলে জীবজগৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসব প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে এক বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। বিষাক্ত কীটনাশক দূষণের অংশবিশেষ আমাদের খাদ্য, পানি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাতাসের সঙ্গে মিশে আজকাল নানা ধরনের অসনাক্ত রোগ দেখা দিচ্ছে। ক্যান্সার, হাঁপানি এবং হৃদযন্ত্রের বেশির ভাগ রোগ ব্রঙ্কাইটিস, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণও এ রোগের মধ্যে পড়ে।

মানুষ শক্তির বিকল্প উৎস সন্ধানের অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি সচরাচর ব্যবহৃত শক্তির উৎস অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসই পৃথিবীর শিল্প উদ্যোগগুলো চালাচ্ছে। এগুলোকে জীবাশ্ম ইন্ধন বলে। এ গুলোর পরিমাণ অতি সীমিত, একদিন সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তথাপি এ-ধরনের ইন্ধনের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এটাকে জ্বালালে কল-কারখানা চালানোর শক্তি পাওয়া যায়। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিন্তু অন্য একটা সমস্যারও সৃষ্টি করে। সমস্যাটি হলো-জীবাশ্ম ইন্ধন পুড়লে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় আর তা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাতাসে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিসাধন করে। পৃথিবীর আদি অবস্থায় যে পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড ছিল এখন তার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশি। যদি বর্তমান হারে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর নেতিকরণে এসেছে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। মার্কসবাদীদের মতে, এর নেতিকরণে আসবে সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখন দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধদেব বাবুরা এর উল্টোটাই করছেন। এতদিন ধরে কমিউনিস্টরা লড়াই চালাচ্ছিলেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় আসার পর দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসার কথা। কিন্তু তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বুদ্ধদেব বাবুরা বলেছেন, সমাজবাদ আনতে পারব না তাই পুঁজিবাদই চাইছি। তাই যদি হয় তবে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে নেতিকরণে বুদ্ধদেব বাবুরা সমাজতন্ত্র আনতে পারলেন না, ফিরে যাচ্ছেন আবার সে পুঁজিবাদেই। কেউ বলতে পারেন যে ভবিষ্যতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র আসবে। তাহলে বলব ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র আসবে বলে পুঁজিবাদটা আনতে হবে কমিউনিস্টদেরই? তাহলে কি কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদের এজেন্ট হয়ে গেলেন? আর যদি মেনে নেই যে পুঁজিবাদ ছাড়া রাস্তা নেই, তাহলে বুদ্ধদেব বাবুরা গত ত্রিশ বছর ধরে সর্বহারার নেতৃত্ব, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি গালভরা বুলি দিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিলেন কেন? আসলে বুদ্ধদেববাবুরা পুঁজিবাদ ও পুঁজির প্রয়োজন দু'টোর মধ্যে পার্থক্য বোঝেননি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করতে গেলেও পুঁজির প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রে মানুষেরা তো হাওয়া খেয়ে থাকবে না। এখন এ পুঁজির প্রয়োজন ও পুঁজিবাদের প্রয়োজন দু'টো এক জিনিস নয়। পুঁজিবাদের প্রবর্তন না করেও যে পুঁজি করা যায় ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তার রহস্য মার্কসবাদীদের জানা নেই। তাই তাঁরা পুঁজিবাদে ফিরে যাচ্ছেন। দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদও মাথা কুটে মরলো।

সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে চোখ দিলে দেখা যাবে, মার্কসবাদের অবৈজ্ঞানিকতাই জন্ম দিয়েছে হাজার মার্কসবাদী দলের। তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে শোধনবাদী বা প্রতিবিপ্লবী বলে সম্বোধন করে নিজেদের সাচ্চা মার্কসবাদী বলে গলা ফাটায়। এরূপ জার্মানির বার্নস্টাইন, রাশিয়ার কাউৎস্কি মার্কসবাদে সংশোধন নিয়ে এসে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির মতবাদ ঢুকিয়েছেন ও শোধনবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ রূপ আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ব্রাউডার বুর্জোয়াদের সঙ্গে চলার পক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। বার্নস্টাইন তাঁর 'ইভোরুশনারি সোস্যালিজম' গ্রন্থে যা বলেছেন তার মূল কথা হলো :

www.pathagar.com

ক. মার্কস পুঁজিবাদের আসন্ন পতনের যে কথা বলেছিলেন তা বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

খ. মার্কস যে সর্বহারা ও পুঁজিপতি দু'টি শ্রেণীর কথা বলেছেন তাও ঠিক নয়,

গ. সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে পুঁজিবাদীদের ঘোষণামূলক চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে।

ঘ. সর্বহারার একনায়কতন্ত্রকে অস্বীকার করে ধীরে ধীরে সমন্বিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বর্তমানে যা বলছেন তা বার্নস্টাইনের কথারই যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ। বুদ্ধদেব বাবুরাও শেষ পর্যন্ত পরিণত হলেন নব্যশোধনবাদীতে।

অবৈজ্ঞানিক মার্কসীয় তত্ত্বের তথাকথিত সমাজতন্ত্র কমিউনিস্ট দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা পায়নি। তাই কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সহাবস্থানের পথে গেছেন, শোধনবাদকে আঁকড়ে ধরেছেন ও শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু তাতেও রাশিয়াকে বাঁচানো যায়নি। শুধু রাশিয়া কেন, সমগ্র কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ধ্বস নেমেছে। টিকে থাকল যে গুটিকয়েক দেশ, তারাও বাজারি অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। যে আমেরিকা দীর্ঘ দিন ধরে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে ভিয়েতনামকে রক্তাক্ত করে তুলল সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ভিয়েতনাম রেড কার্পেট বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। চীনে মাও সেতুঙ্গের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেও সিয়াও পিঙ্গ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বহির্বিশ্বের প্রতি মুক্তদ্বার নীতি অবলম্বনের সপক্ষে নতুন নীতি ঘোষণা করা হয়। হংকং-এর সংলগ্ন সেনজেনসহ চৌদ্দটি শহর বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি সরকারি বিপণন কেন্দ্রগুলোও চীন ও বিদেশী বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এসবই মার্কসীয় অবৈজ্ঞানিক সমাজবাদের পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ।

এ একই পথের পথিক বুদ্ধদেব বাবুরা। অথচ অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের মতো এ দেশের কমিউনিস্টরাও বিপ্লবের আওয়াজ দিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। তাঁরা বুর্জোয়াদের ঘুম কেড়ে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁরাই বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৬৭-৭৭ সালের যে কমিউনিস্টরা টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কারদের শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন আজ তাঁদেরই

www.pathagar.com

আহ্বান জানাচ্ছেন বুদ্ধদেব বাবুরা। বলেছেন—'আমি তেমন কমিউনিস্ট যে ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে আপস করে'। বুদ্ধদেববাবু আরও বলেছেন—'আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্যাপিটালিজম আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা সমাজতন্ত্র প্র্যাকটিস করা যায় না।' বুদ্ধদেব বাবু পরাজিতের মতো বলেছেন, 'বার্লিন প্রাচীরের ভেঙে পড়া আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষকে 'না' বলার অধিকার দিতেই হবে। 'না' বলার স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা-এগুলো যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। ...আমি চাই শ্রমিক-শিল্পপতি উভয়ের মধ্যে একটা হারমনি থাকুক। ... পুঁজির সঙ্গে শ্রমের একটা হারমনি তৈরি না হলে টিকে থাকা খুব মুশকিল।' মার্কস কিন্তু বলেছিলেন, শ্রমিক ও পুঁজিপতি, শ্রম ও পুঁজির মৌলিক দ্বন্দ্ব থাকবেই। সম্প্রতি 'গণশক্তি' পত্রিকায় সিপিএম নেতা নিরূপম সেন লিখেছেন—'বিকল্প বলতে আমরা বামপন্থীরা সাধারণভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্পের কথাই বলে থাকি...পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র। কিন্তু একটি অঙ্গরাজ্য... পার্টির কর্মসূচিতে যে বিকল্প তা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প নয়।' অর্থাৎ সিপিএম নেতৃবৃন্দ তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক, প্রয়োগে পুঁজিবাদী? ভুল, নিরূপমবাবু ভুল। আপনারা অঙ্গরাজ্যে কেন, কমিউনিস্ট দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র সুবিধাবাদীতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরাও সে একই পথের পথিক। এর কারণ কী? কারণ সমগ্র মার্কসবাদটাই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রুটিতে পূর্ণ। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, প্রলেতারিতে নেতৃত্ব, জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিকতাবাদ, শ্রেণীহীন সমাজ, কমিউনিজমের স্বপ্ন, ধর্মের প্রতি অনীহা, ব্যক্তিহীন সমষ্টির জয়গান সমস্তই লক্ষণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মাথা কুটে মরছে। এর থেকে বাঁচতে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ একাধিক 'বাদ'-এর সৃষ্টি করেছেন ও বাদ দিয়েছেন মার্কসবাদকেই। স্বভাবতই হয়েছে 'মার্কসবাদের সুবিধাবাদে আত্মসমর্পণ'।

কৃষিসহ ক্ষুদ্রশিল্প ও মৎস্য উৎপাদন : প্রয়োজন অগ্রাধিকার

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বাবলম্বনের ভিত্তি অবশ্যই কৃষি। এদেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। কৃষিকে উপেক্ষা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষি উন্নয়নে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রসরতার

www.pathagar.com

তাগিদে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা। প্রবল জনবিস্ফোরণ ও ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে স্ব-নির্ভরতা জরুরি। কৃষি ক্ষেত্রে চাপ বাড়ছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষির মান উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যায় সফলতা ও সুফলকে কাজে লাগিয়ে দেশের অনেক শিক্ষিত বেকার আজ স্বাবলম্বী, প্রতিষ্ঠিত ও সফল। বেকারত্ব দূর করতে চাকরির মোহ ত্যাগ করে তারা নানাভাবে কৃষি, মৎস্য উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে চলেছে।

অন্যদিকে আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী সরকারি চাকরির পেছনে ছুটে ক্লান্ত। তারা অনেকেই ভুলে যায়, শিক্ষা শুধু চাকরির ভিত নয়, শিক্ষা জীবনের আলো। শিক্ষিত সমাজ ভুলে যায় সীমিত সরকারি ব্যবস্থায় অজস্র চাকরি প্রদান অসম্ভব। অজস্র চাকরি প্রার্থীর ভিড়ে তাই সরকার দিশেহারা এবং সরকারি আমলাদের কেউ কেউ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতার সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ। ফলে, প্রতিযোগিতার তলে তলে দুর্নীতি বাড়ছে। সমাজ অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। যুবক-যুবতীরা ক্লান্তিতে ভুগছে। অর্থনৈতিক সংস্কার এক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিযোগিতার রেশ ক্রমে আলস্য, জিঘাংসা, হিংস্র লালসায় রূপ নিচ্ছে। এ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে চোরাকারবার, কালো টাকা, চরম পন্থা এবং শোষণ ও অত্যাচার মাথাচাড়া দিচ্ছে। এসব নিশ্চিত সভ্যতার পথে অশনি সংকেত। বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা তাই আজ একান্ত জরুরি।

এ অবক্ষয়ের যুগেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি কার্যকরী ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। তথাকথিত শিক্ষিতদের বাদ দিলেও গ্রামীণ মানুষের যথার্থ অংশগ্রহণ প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষায় সাড়া জাগানো ভূমিকা নিয়ে চলেছে। গ্রামীণ শিক্ষিত যুবকেরা অনেকাংশে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতি ঝুঁকছে। বাস্তবে তারা আজ স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য গড়ে তোলায় সহায়তা করছে। কৃষিক্ষেত্রে তাদের আরো অবাধ যোগদান দেশকে অবশ্যই ভবিষ্যতে এক উন্নত দেশের মর্যাদা দিতে পারে। কারণ কৃষিকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অসম্ভব।

এখন দেশের কৃষি, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। দেখা যায়, দেশের গ্রাম-গঞ্জে জনসংখ্যার চাপ অনেক বেশি এবং কৃষি ক্ষেত্রে তার প্রভাব

www.pathagar.com

যথেষ্ট। শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষিতেও সর্বাত্মক তৎপরতায় উন্নয়ন জরুরি। নানা সমস্যা ব্যর্থ রাজনীতি, সরকারি ভ্রান্তনীতি, পাহাড়ি প্রতিকূলতা, প্রবল জনবিস্ফোরণ প্রভৃতি আমাদের অর্থনীতিতে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করে কৃষিতে আঁকড়ে থাকাই আমাদের প্রধান ভরসা। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে অবাধ যোগদান নিশ্চয়ই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে জীবনযাত্রার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার জীবন মানের দিকে তাকানোর ফুরসৎ আপাতত আমাদের নেই। আমাদের উন্নয়নের পটভূমি কৃষিভিত্তিকই তৈরি করতে হবে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার ২ থেকে ৫ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী, অন্যদিকে আমাদের দেশের ৭০ শতাংশই কৃষিজীবী। আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ ধ্রুবসত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের এখন মাঠে নামতে হবে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা অর্থনীতি উদ্ধারে নিবেদিত হতে হবে। কৃষিক্ষেত্র থেকে মুখ না ফিরিয়ে নিজ অধিকার বলে 'হরির লুট'-কে নিয়ন্ত্রণ করে স্বনির্ভর হতে হবে। কৃষির উন্নতিতেই গ্রামীণ স্ব-নির্ভরতা এবং গ্রামীণ স্ব-নির্ভরতাতেই বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ। বিভিন্ন পরিকল্পনায় সরকার কৃষির উন্নয়নে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে চলেছে তারও মনিটরিং দরকার। কোথায়, কি বাবদ, কত টাকা মঞ্জুর হচ্ছে, কিভাবে খরচ হচ্ছে শিক্ষিত সমাজকে তার খতিয়ান রাখতে হবে এবং নিঃস্বার্থ সেবায় তা পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি গ্রামে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের ভূমিকাও অপরিসীম। সংবাদ মাধ্যমে যেন রাজনৈতিক নেতাদের কেচ্ছাকাহিনীর পাশাপাশি সরকারি সব ব্যবস্থার স্বচ্ছ তালিকা সর্বদা যথাযথ ও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে লাখ লাখ অর্ধাহারি, অনাহারি মানুষের মৌলিক চাহিদার দিকে প্রথম তাকানোর আবশ্যকতা রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি নিতান্ত পিছিয়ে নেই। দেশের অর্থনীতি এবং আত্মশান্তির বাতাবরণ গ্রামীণ অর্থনীতির উপরই টিকে রয়েছে। প্রয়োজন আরো গতি সঞ্চার। প্রবল জনবিস্ফোরণ এবং পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি, দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের সুযোগে আমাদের সমাজব্যবস্থা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। এক্ষেত্রে কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আধুনিকতার

www.pathagar.com

পরশে চিরাচরিত দেশীয় জীবনযাত্রার মৌলিকতা সুরক্ষিত রেখেও নতুন দিশার সূচনা করতে পারে। হস্তশিল্প, বয়ন শিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আমাদের অনেক উন্নতি ঘটাতে পারে। মৎস্য চাষ, ফুল চাষ, পাট চাষ, পান চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ প্রকল্প, ইক্ষু চাষ এবং তদসঙ্গে চা শিল্প ও কাগজ শিল্প আমাদের অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখাতে পারে।

পাহাড়িদের জুমচাষ আমাদের অর্থনীতিতে যথেষ্ট সমাদৃত। এসব ক্ষেত্রে তাদেরও উন্নত চিন্তাধারা এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। বনজ সম্পদের অবাধ ধ্বংস রোধ করে জুমচাষীর চাষ ক্ষেত্রকে উন্নত প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সরকারি সহযোগিতা ও অনুদানের প্রয়োজন এবং সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত বাজার ও পথঘাটের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। আর সেজন্য অর্থনৈতিক প্রগতিতে আনতে হবে বাস্তবমুখী ও উৎপাদনমুখী পদক্ষেপ।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান চিরন্তন। যাযাবর জীবনের অবসানে কৃষি সভ্যতার গোড়াপত্তনেও নারীর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আমরা বাংলাদেশী নারীকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলে জানি। বাস্তবে নারী দূরদর্শী ও অধ্যবসায়ী। আদর্শ সমাজ গঠনে অগ্রদূত। কৃষি সভ্যতার এ দেশে গ্রমীণ মহিলারা পুরুষের কর্মক্ষেত্রের নিত্য অনুষঙ্গী। পশুপালন থেকে আরম্ভ করে চাষাবাদ এবং দ্রব্যের বাজারীকরণ সর্বত্রই নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগদান গ্রামীণ জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এক কথায়, গ্রামীণ অর্থনীতিনির্ভর দেশীয় অর্থনীতিতে এবং সমাজ জীবনে নারীর অবদান ও ভূমিকা অপরিমেয়। যে জাতির নারীরা যত উন্নত মানসিকতায় সমুন্নত সে জাতির অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ভারসাম্য তত বেশি সুরক্ষিত। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে অনেক মহিলা ও যুবতীর প্রত্যক্ষ অবদান চোখে পড়ার মতো। তারাই মাঠে বর্ষাকালীন শস্য থেকে রবিশস্য উৎপাদনের সময় পর্যন্ত নিরলস সহায়তা করে যায়। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সিংহভাগ মহিলাকেন্দ্রিক ও মহিলানির্ভর। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মেয়েদের অবাধ ও নির্ভয়ে যোগদান আমাদের অর্থনীতিকে শুধু চাঙ্গা করবে না বরং এক মজবুত আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সূচনাও ঘটাবে। ফলে নারীরা শুধু বোঝা হবে না বরং সমাজের এ অর্ধাংশের যোগদানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নারী মুক্তিকে সুনিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে উপজাতি মহিলা, চা-শ্রমিক মহিলা, মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মহিলারা আমাদের আদর্শ প্রেরণা হতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক তাগিদে নারীদের আরো সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের প্রতি সমাজ ও সরকারের আরো সহায়তা দান করতে হবে। তাদের প্রেরণায় সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নারীরা আরো তৎপর হয়ে উঠবে। শুধু হস্ত বা বয়ন শিল্প নয়, কৃষিভিত্তিক প্রতিটি অর্থনৈতিক উৎসেই নারীর অবদান বেশি। সু-পরিকল্পিত অবাধ যোগদানে নারীদের আরো নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে আসার প্রতীক্ষায় সমাজ।

আগামী বাংলাদেশে অবশ্যই অর্জিত হতে পারে কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও তা গ্রামীণ নারীকুলের স্বতঃস্ফূর্ত যোগাদানের মাধ্যমে। গ্রামীণ মহিলাদের পাশাপাশি শহুরে মহিলারা গ্রামের এবং গ্রামভিত্তিক সভ্যতার সৌন্দর্যশোভা আস্বাদন করতে পারে। শহুরে মহিলারাও শিক্ষা-দীক্ষার দৃঢ়তায় ও আধুনিক জনসংযোগ আদি সুবিধার সাহায্যে দেশীয় অর্থনীতিতে গ্রামীণ মহিলাদের পাশাপাশি কাজ করতে পারে। শহুরে মহিলারা গ্রামীণ সামগ্রীর বিপণন কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু প্রত্যন্ত এবং অত্যন্ত নিপীড়িত অঞ্চল ছাড়া গ্রামীণ মানুষ কিন্তু কু-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নয়। শিক্ষিত সমাজে শিক্ষিত মহিলারা প্রকৃত শিক্ষার আলো হাতে পথভ্রষ্ট বাংলাদেশকে নিশ্চয় উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। প্রয়োজন সমন্বয়ের, সময়ের। এদিকে বাংলাদেশে নদীনালা, খাল বিলের অভাব নেই। এসব স্থানে মৎস্য উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও নানা কারণে এখনও মৎস্য উৎপাদন খুবই নিরাশাজনক। মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার নানা কারণ বর্তমান। যেসব চাষীগোষ্ঠী বিলে মাছ চাষ করেন, তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে কি পদ্ধতিতে চাষ করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বছরের পর বছর এভাবে অনেক উৎপাদন গোষ্ঠী বিলে মাছ চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সুতরাং কি কি কারণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

* সাধারণত বিলের পারগুলো উঁচু থাকে না এবং এগুলো প্রধানত অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত।

* বিলে এত বেশি জলজ আগাছার জন্ম হয় যে সেগুলোর মড়ক হলে তার পচনক্রিয়ার ফলে কাদার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ক্রমাগত কাদার পরিমাণ পেলেও সে কাদা তুলে এগুলোর সংস্কার করার পরিকল্পনা কদাচিৎ গ্রহণ করা হয়। এর মূল কারণ হলো অর্থ ও জানার অভাব। সে কাদা ক্রমাগত

www.pathagar.com

থাকার দরুন এসব জলাশয়ে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ফলে মাছের বাড়ন বৃদ্ধি পায় না। প্রচুর কাদা থাকার ফলে পানির গভীরতা অনেক কমে যায় এবং বছরের পর বছর ক্রমাগত হ্রাস পায়। শুধুমাত্র বর্ষার সময় পানির গভীরতা সামান্য বৃদ্ধি পায় তবে বছরের অন্য সময় গভীরতা এক রাখা সম্ভব হয় না।

* বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কীটনাশক ঔষধ ধুয়ে বিলে এসে পড়ে। কখনো কখনো পার্শবর্তী শহরাঞ্চল থেকে অথবা কোনো কলকারখানা থেকে দূষিত পদার্থ বিলে এসে পড়ে। তার প্রতিক্রিয়া এ মাছগুলোর উপর পড়ে ফলে বিলের মাছের উৎপাদন কমে যায়।

* বর্ষার সময় পানি প্রবেশের বিভিন্ন পথ দিয়ে অসংখ্য মৎস্যভুক মাছ বিলে প্রবেশ করে। এগুলো পোনা মাছের চারা ভক্ষণ করে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এ জলাশয়গুলোর পোনা মাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে যায়। এর ফলে পুকুরে পোনা মাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

* অধিকাংশ বিলে মাছে পোনা মজুতের সংখ্যা ঠিক রাখা যায় না। প্রায় সর্বত্র অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের চারা মজুত করা হয়। এ জলাশয়গুলোতে অবস্থিত মৎস্যভুক মাছ থাকার ফলে সে চারা দ্রুত নষ্ট হয় যায়, কাজেই মাছের উৎপাদন কমে যায়। মানে জলাশয়ে অবস্থিত মৎস্যভুক মাছ, সর্প ও বিভিন্ন প্রকারের পাখি ছোট আকারের মজুত করা মাছের পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়।

* সব বিলে পানির গভীরতা এক থাকে না। গভীরতা অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মজুত করা হয় না। গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাছের পোনা মজুত হয় না। ফলে কোনো প্রজাতিরই মাছের বাড় ভালো হয় না। মাছের উৎপাদন কমে যায়।

* প্রতিটি বিলে এক দফায় মাছের চারা মজুত করা হয় না। যতদিন মাছের পোনা পাওয়া যায় দফায় দফায় বিভিন্ন প্রজাপতির এবং বিভিন্ন মাপের পোনা বিলে মজুত করা হয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত ছোটমাপের পোনার ক্ষতি হয়। কারণ ছোট মাপের পোনার সাথে বড় মাপের পোনার খাদ্য এবং বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। তাতে ছোট মাপের পোনার ক্ষতি হয়। সেগুলো খাদ্যাভাবে অপুষ্টিতে ভোগে এবং অবশেষে সেগুলোর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

* অধিকাংশ বিল এত বড় এবং এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে এসব জলাশয় থেকে মাছ চুরি হয়। ফলে উৎপাদন কমে যায়। এর প্রতিকার আবশ্যক।

১. বিলে কাদা তোলার খরচ বেশি হলেও পর্যায়ক্রমে বিলের এক একটি অংশের কাদা তুলে ফেলতে হবে। এর জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হবে কয়েক বছর মাছ চাষ করার ফলে সে অর্থ বেরিয়ে আসবে।

২. পারগুলো যেন যথেষ্ট মজবুত থাকে। না হলে চাষের উপযোগী পোনা মাছ বাইরে চলে আসবে এবং বাইরের মৎস্যভুক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী বিলে ঢুকে পড়তে পারে।

৩. বিলের বিভিন্ন জায়গায় পানি প্রবেশ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে সেগুলোর মুখে জাল বসিয়ে দিতে হবে—ফলে বিলের মাছ যেমন বেরিয়ে যেতে পারবে না, তেমনি মৎস্যভুক মাছও বিলে প্রবেশ করবে না।

৪. যে কোনো রকম দূষণ বন্ধ করতে হবে। বিলে যদি পাট পচাতে হয় তবে এ জলাশয়গুলোর এক একটি অংশে পাট পচানোর কাজ করবেন। বিলের যে কোনো জায়গায় পাট পচানো যাবে না। তাতে মাছের ক্ষতি হয়। কোনো কলকারখানা অথবা পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলের নালা-নর্দমার পানি যেন সরাসরি বিলে প্রবেশ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ যে কোনো প্রকার দূষণ মাছের বাড়ের জন্য ক্ষতিকারক।

৫. কিভাবে বিলের পানির গভীরতা ঠিক রাখা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। এসব জলাশয়ের কাদা তুলে দিলে স্বাভাবিক কারণে এগুলোর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া পার্শবর্তী কোনো পানিধার থেকে পানির উৎস থেকে নিয়মিত পানি প্রবেশের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাতে সারা বছরই বিলে পানির গভীরতা ঠিক রাখা যায়।

চ. যেহেতু যে কোনো বিলে মৎস্যভুক মাছ একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়, সেজন্য মাছের ভালো উৎপাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছের পোনা মজুত করতে হবে। (১০-১৫ সে.মি.)।

ছ. পানির গভীরতা অনুসারে পোনা মজুতের হার নির্ণয় করতে হবে। পানির গভীরতা কম থাকলে সবকটি প্রজাপতির পোনা মাছ চাষ করা যাবে না। তাতে কোনো পোনা মাছেরই ভালো ফলন পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

জ. বিলে সর্বদা এক দফায় মাছের চাষ করা উচিত। তাতে ভালো ফলন পাওয়া যায়। দফায় দফায় বিভিন্ন মাছের চারা দিলে পরের চারাগুলো ভালোভাবে বাড়তে পারে না। এর ফলে অর্থের অপচয় হয়। বছরের শেষে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

প্রকৃতিজাত মৎস্য কমে যাওয়ায় বিলে উপযুক্ত সময় উপযুক্ত প্রজাতির মাছ স্টক করা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় মাছের বীজ স্টক করাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। বেশির ভাগ বিলে দেখা গেছে যে মাছের পোনা মজুত করা হয় না। বিলের কোনো সংস্কার করা হয় না। বিল সরকারিভাবে লিজ দেয়া হয় সেগুলোতে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদনের উপর লেছি পুরো নির্ভরশীল। লিজ বাবদ যে টাকা ধার্য করা হয় সে টাকা মিলিয়ে যে লাভটুকু থাকল, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

যতদিন পর্যন্ত না বিলের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে ততদিন মাছের অভাব থাকবেই। বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে ০.০৩ হেক্টর থেকে ০.৪০ হেক্টর পর্যন্ত পুকুরে মাছ চাষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় হলেও মাছের উৎপাদন তেমন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে না।

প্রতিটি বিলের সমস্যা এক নয়। বিলের সমস্যা নির্ভর করে জলাশয়ের অবস্থান ও গুণাবলীর উপর। সুতরাং বিলের সমস্যাগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছু খরচ অবশ্যই করতে হয়। মাছচাষ একটি ব্যবসাভিত্তিক উদ্যোগ। সুতরাং এসব খাতে অর্থলগ্নি করলে বছরের শেষে মাছের উৎপাদন হলে সে লগ্নিকৃত টাকা উদ্যোক্তার হাতে ফিরে আসবে। সুতরাং বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টাকা খরচ করলে ক্ষতি হবে না মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্যোক্তা লাভবান হবেন। বিল ছাড়াও হাওর-বাওড়, পুকুর ও নদ-নদীতে পরিকল্পিতাবে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। মৎস্য উৎপাদন বাড়লে আমিষের ঘাটতি পূরণ হবে। এ খাতে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানও হবে।

www.pathagar.com

হুন্ডি বন্ধ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি : প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ

আমাদের দেশ ছোট্ট। উন্নয়নশীল। জনসংখ্যা অধিক। এ ছোট্ট ভূখণ্ডে বাস করেন প্রায় ১৫ কোটি মানুষ। এ বিরাট জনসংখ্যার দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে আমদানি করতে হয় নানা পণ্য। এদিকে দেশেত বটেই বিদেশেও কৃষি, শিল্পসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে হু হু করে। তেলের দামতো বাড়ছে এমন হারে যা নিয়ে বিশ্বের ধনী দেশগুলোকেও পরিস্থিতি মোকাবেলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাদেরকেও এখন হিসাব করে চলতে হচ্ছে।

মানুষের নানাবিদ চাহিদা মেটাতে আমাদের আমদানি করতে ব্যয় হয় বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা। এছাড়া ভর্তুকি দিতে হয় তেল, সারসহ অন্যান্য অনেক পণ্যে। সরকার এবার সারের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। এরপরও একটা মোটা অংকের টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। এ বৃদ্ধি জনিত কারণে কৃষকরা কিছুটা হলেও অসন্তুষ্ট। তাদের বক্তব্য এ মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এদিকে এবার বোরোর বাম্পার ফলন হলেও সারের মূল্য বৃদ্ধি ও বৈরী আবহাওয়া জনিত কারণে আমন ফসল আশানুরূপ নাও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কোনো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে নিরাপদ মাত্রায় রাখতে হলে সে দেশের কমপক্ষে ৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখতে হয়। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএফএম) একই পরামর্শ দিয়ে চাপ অব্যাহত রাখে। তাই বাধ্য হয়েই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে হয়। আন্তর্জাতিক চাপ ও বিশ্বের অর্থনৈতিক হাল অবস্থা বিবেচনায় গেল বছরের চেয়ে এ বছর ১০০ কোটি টাকা বেশি রিজার্ভ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংককে। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নানামুখী উদ্যোগও নিতে হচ্ছে।

এ মুহূর্তে মনে পড়ছে—বেশ ক'বছর আগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরামর্শ দানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ফ্রান্সের ম্যারাডোনা নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক অর্থনীতিবিদ এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি বেশ ক'দিন বাংলাদেশে অবস্থান করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে দেশে ফেরার আগে বাংলাদেশ সরকারকে ৩টি পরামর্শ দান করেন। তা হলো :

www.pathagar.com

১. দেশে প্রচুর পরিমাণে রাস্তা-ঘাট আছে। টিলা, পতিত জমি, বেড়ি বাঁধ আছে। চা বাগান, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর খালি জমি আছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐ সব স্থানে এবং রাস্তার উভয় পাশে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করে বনাঞ্চল সৃষ্টির পরামর্শ প্রদান করেন। এতে দেশের কাঠের, ফলমূলের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

২. অবহেলা, অনাদরে পড়ে থাকা জমি কৃষির উপযুক্ত করে উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে দেশে খাদ্যাভাব থাকবে না বরং উদ্বৃত্ত কৃষিজ পণ্যাদি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদিশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

৩. দেশে বড় আকারের অনেক বিল, হাওর এবং নদী আছে। গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য পুকুর আছে যেগুলোতে মাছ চাষ করা হয় না। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব খাল, বিল, হাওর, নদী ও পুকুরে মাছ চাষ করলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে মাছ রপ্তানি করে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। তবে তিনি মৎস্য পোনা বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাছ না ধরার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য সরকার এসব পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারেন।

আমাদের দেশ থেকে একসময় প্রচুর পাট বিদেশে রপ্তানি করা হতো, এখন কমে যাচ্ছে। গার্মেন্টস সেক্টরও অস্থির। জনশক্তি রপ্তানি আরো জোরদার করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্য সরকার তথা সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহকে আরো তৎপর হতে হবে। জোর দিতে হবে ইংরেজি শিক্ষার উপরও।

মনে রাখতে হবে বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগই আসে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের নিকট থেকে। কিন্তু নানাবিদ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা আগমন বৃদ্ধির প্রবাহ আশানুরূপ নয়। এর অংক দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এটা সত্য বৈধ পথে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ আশানুরূপ নয়। এর অংক দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি হওয়া উচিত। এটা সত্য অবৈধ এ পথে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনজনিত কারণে একটা মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। হুন্ডি একটি অবৈধ ব্যবসা। এ ব্যবসা দেশের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে দীর্ঘদিন থেকে। সরকার অবৈধ হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করতে

www.pathagar.com

ইতোমধ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিছুটা কড়াকড়িও আরোপ করা হচ্ছে। যারা এ অবৈধ ব্যবসায় জড়িত তারা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এ অবৈধ কাজে জড়িতদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার হওয়া উচিত। তবে এটাও ঠিক ঢালাওভাবে বিশেষ কোনো গ্রুপের লোকজন এ ব্যবসায় জড়িত তা বলা সমীচিন নয়। যেমন ট্রাভেল এজেন্ট, মানি চেঞ্জারস ব্যবসায়ী। সকলেই নিজ নিজ লাইসেন্স, অফিস, লোকজন নিয়ে ব্যবসা করছেন। তাদের এসব ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন হাজার হাজার মানুষ। তাদের আয়ে চলছে সংসার। এ ব্যবসা বেকার সমস্যা সমাধানে কিছুটা হলেও অবদান রেখে চলেছে। এসব ব্যবসায়ীর মধ্যে কেউ কেউ হয়ত হুন্ডি ব্যবসার সাথে জড়িত থাকতে পারেন। যদি থেকে থাকেন তবে তাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এটা দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মতো আমাদেরও প্রত্যাশা। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করবেন এটা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কামনা।

এটাও ঠিক দেশ-বিদেশে অবস্থানরত কিছু অসৎ লোক হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার করে দেশের অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে চলেছে। হুন্ডি বন্ধে এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আগমন যাতে বৃদ্ধি পায় সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু সুচিন্তিত পরামর্শ এ লেখার মাধ্যমে সরকার বরাবরে পেশ করছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক ছিল। তখন দেশের একমাত্র ভরসা ছিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও ধনী দেশের সাহায্য। মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিদেশে কর্মরত ছিল তাদের দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা হুন্ডি হয়ে দেশে আসতো। যোগাযোগের মাধ্যম ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ধনী ও উন্নত দেশের সঙ্গে ব্যাংকিং লেনদেন প্রায় ছিলই না। দেশে বৈধ পথে বৈদেশিক মুদ্রা না আসার ফলে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছিল। বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ পথে আসার লক্ষ্যে সরকার তখন দেশের অর্থনীতিবিদদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তাদের পরামর্শক্রমে 'ওয়েজ আনার্স স্কিম' চালু করেন। অর্থনীতিবিদদের এ সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পর্যায়ে তৎপরতা শুরু হয় এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন বাড়তে থাকে। এ স্কিম চালু করার ফলে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীরা ভীষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে শুরু করেন। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিপরীতে হুন্ডি ব্যবসার দাপট কমতে থাকে।

www.pathagar.com

এদিকে বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতেও আয়ের উৎস সন্ধানে বিপুল সংখ্যক লোক আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সৌদিআরব, কুয়েত, মালয়শিয়া, ব্রনাই, মালদ্বীপ, লিবিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতে শুরু করেন। তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আগমন শুরু হয়। এসময় বৈদেশিক মুদ্রা ড্রাফট/চেক ইত্যাদি প্রবাসীদের পোষ্য বা বেনিফিসিয়ারীরা দেশে কয়েকটি নির্ধারিত ব্যাংক শাখা তাদের হিসাবে জমা দিয়ে সুবিধামতো সময়ে বিক্রয় করতে পারতেন। এছাড়া কিছু বৈধ লাইসেন্সধারী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের মাধ্যমে ব্যাংকে নিলাম পদ্ধতি চালু ছিল। প্রতিদিন নিলামে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার দর ওঠানাম করতো। এতে একদিকে প্রবাসীদের বেনিফিসিয়ারীরা তাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকে নিজ একাউন্টে জমা রেখে সুবিধামতো সময় বিক্রয় করতে পারতেন, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে এলসি বা অন্য প্রয়োজনে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারতেন। বৈদেশিক মুদ্রা দেশে এভাবে বেশি করে আসার ফলে দেশের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজে সরকার এ মুদ্রার ব্যবহার করতে পারতেন। এছাড়া বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক এ ব্যবসাতে খেটে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারতেন। এসব কারণেই সরকার প্রবর্তিত 'ওয়েজ আনার্স স্কিম' দেশ-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষের আগ্রহও ক্রমশ এ স্কিমের প্রতি বাড়তে থাকে।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এক অশুভচক্র এ সহজ প্রথার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ স্কিম বন্ধের পাঁয়তারা শুরু করে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'ওয়েজ আনার্স স্কিম' বন্ধ হয়ে গেলে হুন্ডি ব্যবসা চলবে জোরেশোরে। হলোও তাই। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তি মারফত পূর্বে সহজভাবে প্রবর্তিত প্রথা বন্ধ করা হয়। এর ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন কমতে থাকে। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বিদেশে তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে বর্ধিত মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে থাকে। সরকার পাউন্ড/ডলারসহ সকল বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ায় প্রবাসীরা এ পথে অর্থাৎ ব্যাংক মারফত বৈদেশিক মুদ্রা না পাঠিয়ে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে থাকে। এতে তারা একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার দাম বেশি পেতে থাকে অন্যদিকে কোনো জটিলতা ছাড়াই দেশে স্বল্পসময়ে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা প্রবাসীদের পোষ্যদের টাকা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে শুরু করে। হুন্ডি ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় দেশ বঞ্চিত হতে থাকে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক

www.pathagar.com

মুদ্রা থেকে। তারা দেশের সরকার নীতি-নির্ধারক বা ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে বিদেশে কর্মরতদের প্রতি পাউন্ড/ডলারের মূল্য সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে ৩/৪ টাকা বেশি দিতে থাকে। সহজে বাড়িতে টাকা পৌঁছে দেয়ারও গ্যারান্টি দিতে থাকে প্রবাসী ও তাদের পোষ্যদের। এতে প্রবাসীরা সরকারি জটিলতা ও পদ্ধতি এড়ানোর জন্যে হুন্ডি পদ্ধতিকেই গ্রহণ করতে শুরু করেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বিদেশের যে সমস্ত শহরে বাংলাদেশীদের অবস্থান বেশি সেসব স্থানে তারা ব্যাংকের মতোই বুথ খুলে বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশীদের কাছ থেকে নিয়ে তার বিপরীতে সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত 'টুকা' ইস্যু করছে। এটুকাই বাংলাদেশে তাদের টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদানের নিদর্শন। ইদানিং দেশের কোনো কোনো বেসরকারি ব্যাংক সরাসরিভাবে হুন্ডি ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। এ অবৈধ ব্যবসার ফলে একশ্রেণীর ব্যাংক কর্মকর্তা, হুন্ডি ব্যবসায়ী ও সরকারি কোনো কোনো এজেন্সীর লোকজন লাভবান হলেও অস্বীকার করা যাবে না যে, এতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। দেশ ও জাতি হাজারো কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা যাতে বেশি করে বৈধ পথে দেশে আসে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ওয়েজ আনার্স স্কিম' পুনঃ চালু করার জন্য দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বণিক সমিতি বৈধ মুদ্রা ব্যবসায়ী সংগঠনসহ নানা সংগঠন সরকার বরাবরে প্রস্তাব পেশ করেছে। পাউন্ড/ ডলারসহ সকল ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা খোলা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের এবং হুন্ডি ব্যবসা বন্ধের জন্যে তারা কয়েকটি সু-চিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে দিয়ে থাকলেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা আজও গৃহীত হয়নি। সুপারিশের মধ্যে রয়েছে :

১. প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা বেসরকারি পর্যায়ে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় খোলা বাজারে কয়েকটি নির্ধারিত ব্যাংক শাখার মাধ্যমে ফ্লোরে ক্রয়/বিক্রয় এবং উচ্চমূল্যের নিলামের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন।

২. একই সাথে ব্যাংকের এফসি একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখা এবং একাউন্ট হোল্ডার বা বেনিফিসিয়ারীদের যে কোনো সময়ে তা বিক্রয়ের সুবিধা প্রদান।

www.pathagar.com

৩. এলসি খোলার জন্য আমদানিকারকদের মাধ্যমে দেশের এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে ফান্ড ড্রাফট মারফত ট্রান্সফার-এর ব্যবস্থাকরণ।

৪. শুধু ডলার/পাউন্ড নয় অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা যেমন রিয়াল, দিরহাম, কুয়েতী দিনারসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুদ্রা লেনদেন সহজকরণ এবং ব্যাংকে জমা দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. প্রকৃত মুদ্রা ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে যাচাই বাচাই করে মানি চেঞ্জিং লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের দ্বারা সংগৃহীত সবধরনের মুদ্রা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা নেয়ার ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ব্যাংকই মানি চেঞ্জারদের নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা জমা নিতে অনিচ্ছা ভাব পোষণ করেন। এতে বৈধ মুদ্রাব্যবসায়ীদেরকে এসব মুদ্রা নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার যেহেতু পাউন্ড/ ডলার ছাড়া অন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকে জমা রাখা হয় না তাই মুদ্রাব্যবসায়ীরা এসব মুদ্রা ক্রয় না করার ফলে হুন্ডি হয়ে বিদেশে পাচার হওয়ার খবরাখবর পত্রপত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা করার জন্য বেশ কিছু লাইসেন্স ইতিমধ্যে ইস্যু করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করার পাশাপাশি বৈধভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ এবং এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো দরকার। এ ব্যাপারে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী দূতাবাসকেও তৎপর হওয়া উচিত।

দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন

কোনো দেশের অর্থনৈতিক জীবনের স্পষ্ট পরিচয় পেতে হলে এর অর্থনৈতিক কাঠামোর অধ্যয়ন আবশ্যক। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, মূলধন গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও এর বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি থেকেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি অনুমান করা যায়। তাছাড়া শিক্ষা, আয় ও স্বাস্থ্য পরিসেবা এ তিনটি সূচক মোটামুটিভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে এবং সামগ্রিকভাবে এ তিনটি এক সঙ্গে মানব উন্নয়ন সূচকও নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবশক্তি রয়েছে তার যথাযথ

www.pathagar.com

ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ও জীবনযাত্রার মানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথা অনস্বীকার্য, পরিবার, সমাজ তথা দেশের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থনীতি। এ অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে চলা মানে লক্ষ্যবিহীন চলা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে পৃথিবীর সব দেশকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ক. উন্নত খ. উন্নয়নশীল এবং গ. স্বল্পোন্নত। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ওপর এ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বাস করে। স্বল্পোন্নত দেশ বলতে সেসব দেশকে বোঝায় যাদের বর্তমান মাথাপিছু আয় অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অতি নগণ্য এবং দারিদ্র্য প্রকট, অথচ যাদের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন এবং মাঝে মধ্যে এর হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা একশ বিশ কোটির কাছাকাছি। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ৪৬টি দেশ ১৯৯০ সালের তুলনায় অধিক গরিব হয়েছে। প্রতি ঘণ্টার বর্তমান বিশ্বে ১২০০ শিশু মৃত্যুর কোলে মাথা রাখছে, এর একটাই কারণ দারিদ্র্য। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের মোড়কে বাজার অর্থনীতির ভিত্তি উন্নয়নের মূল কথা হলো—জনপিছু সর্বোচ্চ উৎপাদন, সর্বাধিক কর্মসংস্থান নয়। এ হচ্ছে বিশ্বায়নের ফসল। আমাদের মতো গরিব দেশ ও গরিব মানুষের কাছে বিশ্বায়ন চিরদিনই অধরা হয়ে থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি বিশেষ করে বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে সরকারের চরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সেজন্যই প্রথমে যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি তা হলো দারিদ্র্য কাকে বলে তা যদি সঠিকভাবে নিরূপিত না হয় তবে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে যেমন বিতর্ক থাকবে তেমনি বিতর্ক থাকবে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীদের সংজ্ঞা নিয়েও। জাতীয় আয়ের অনুপাতে নিম্নতম আয় কাদের এবং কেন তাও নিরূপিত হবে না, হতে পারে না। জাতীয় আয়ের কত শতাংশ আয়ের ভাগীদার ওই দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীরা, তারও সঠিক কোনও তথ্য আজ পর্যন্ত তুলে ধরা হয়নি কোথাও। ন্যূনতম মজুরিকে যদি দারিদ্র্য সীমায় ধরা হয় তাহলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কত দাঁড়াবে এ বিষয়েও নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এব্যাপারে সঠিক তথ্যের অভাবের ফলে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ অর্থনীতি অবশ্যই আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দারিদ্র্য অতি প্রকট। এটি অর্থ ব্যবস্থাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। চরম দারিদ্র্য প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশে চক্রের মতো আবর্তনশীল। এসব দেশে লোকের আয় কম। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়, মূলধন গঠন কম হয় এবং মূলধন গঠন কম হলে বিনিয়োগ সম্ভব হয় না তাই আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে না। অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতাই নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ, এ নিদারুণ দারিদ্র্য প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের একটি প্রধান সমস্যা। এ প্রসঙ্গে prof. Regner Nurksee মন্তব্য করেছেন, 'কোনও দেশ দরিদ্র বলেই দরিদ্র হয়' অর্থাৎ জনসংখ্যার বিপুল অংশ দরিদ্র বলেই কোনো দেশ দরিদ্র হয়। তাই দেশের অগণিত মানুষকে অতিশয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। এখন প্রশ্ন জাগে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্যের প্রবণতা বৃদ্ধির মূল কারণ কী? বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্যের প্রবণতা বৃদ্ধির অনেক কারণের মধ্যে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ এবং দারিদ্র্য পছন্দ করা অন্যতম। এছাড়া :

*স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মাটির মালিক হওয়াকে বিশেষ মর্যাদার বিষয় বলে গণ্য করা হয়। ফলে স্বল্প ও মুনাফাহীন হলেও প্রত্যেকেই নিজের নামে এক খণ্ড জমি পাওয়ার কামনা করে। এ মোহ এবং উত্তরাধিকার আইন নামক নিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে যার কৃষি জমির বিশেষ প্রয়োজন নেই, সে ব্যক্তিও পৈতৃক সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্রতম জমি খণ্ডটুকু ভাগ করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

* আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় ৫০ শতাংশ লোক দিনে এক বেলাও আহার সংগ্রহ করতে পারে না। সরকারি মতে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, ৩০ শতাংশেরও কিছু বেশি লোক দুই বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। দেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্য যে সব সময়ই উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। অভ্যন্তরীণ স্তরে এ-যে অসম বণ্টন তার প্রতিকারের কোনো সদিচ্ছা যে রাষ্ট্রনেতাদের আছে এমন কোনো আভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে একদিকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য গুদামে থাকবে এবং পচবে অন্যদিকে দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে।

* অল্প উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি হওয়ার মূল কারণ গরিব পিতামাতা ধরে নেন যে সন্তানের সংখ্যা অধিক হলে ভবিষ্যতে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অধিক সন্তান

www.pathagar.com

জন্ম দেন। তাছাড়া চরম দারিদ্র্যের দরুন হতাশাগ্রস্ত মানুষ কাম-ক্ষুধা চরিতার্থ করে সাময়িকভাবে পেটের ক্ষুধা থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

* অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্য সামাজিক স্তরে এক বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এটি খুব ধীর গতিতে কাজ করে বলে সহজে এ কারণটিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সরকার সব দেশেই আপন আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিলেও সেগুলো রূপায়ণের দায়িত্ব যেসব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাদের নিষ্ঠা, সততা ও কর্ম প্রচেষ্টার অভাব প্রকল্পগুলো থেকে যে সুফল লাভের আশা করা হয় সেটি লাভ করা যায় না।

* সামাজিক শ্রেণী বিভেদ, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিভেদ, কর্মে শ্রেণী বিভেদ, উচ্চ-নিচু ভেদাভেদ এবং নিরক্ষরতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। আমরা দেখেছি নিরক্ষরতা, জাত-পাতের বৈষম্য, সরকারি আমলা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি, সরকার গৃহীত প্রকল্প রূপায়ণ ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে চলেছে। এর ফলে দারিদ্র্য মোচনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবে কোনও স্থির পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া এদেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের নিরক্ষরতা তাদের বঞ্চিত থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে।

* দেশে জনপ্রতি আয় বা জিডিপি বৃদ্ধি হলেই সে দেশে দারিদ্র্য কমে যাবে এমনটি মনে করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। ইতিপূর্বে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও উল্লেখ করেছিলেন, কোনও দেশে দুর্ভিক্ষের মূলে খাদ্য দ্রব্যের অভাব নয়, বণ্টন বৈষম্য ও সরকারের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতাও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারে।

* দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার ফলে আমাদের দেশের মতো স্বল্পোন্নত/উন্নয়নশীর দেশের কৃষি উৎপাদনের পরিকাঠামোই ভেঙে পড়েছে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ছিল সেটিও সংকুচিত হয়ে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। এ অবস্থায় অনিবার্যভাবেই চলেছে সে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি যাদের ক্রয় ক্ষমতা বাজার দরের নিচে। ফলে অপর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন ঘটলেও সেটি লভ্য নয় বহু কোটি মানুষের কাছে। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা এখন হাত ধরাধরি করে গ্রাস করতে চলেছে মানবকুলকে। কোটি কোটি মানুষ এমন স্তরে রয়েছেন যে,

www.pathagar.com

তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলতে প্রায় কিছুই নেই এবং তার কারণ দারিদ্র্যের বিস্তৃতি লাভ। বিশ্বের অর্থনৈতিক ধারা এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যা বিত্তশালীকে আরও বিত্তবান হতে সাহায্য করছে কিন্তু দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত জনগণের সে অর্থনীতি সামান্যতম সহায়তা করছে না। খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীর মূল্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থপূরণে নিরূপিত হচ্ছে। প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেসব নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার সিংহভাগই বিশেষ নির্দিষ্ট কারিগরি দক্ষতার দাবি করে যা অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির আয়ত্বের বাইরে।

* বাংলাদেশে ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছিল দেশ গঠনের দায়িত্বে অর্থাৎ গরিব ও দরিদ্র লোকদের কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রে ঋণ দান করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিন্তু বর্তমান ব্যাংক উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও আর্থিকভাবে দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হয়েছে সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন কারণে দারিদ্র্যের পরিমাণ ও গভীরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য দূরিকরণ প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আয়ের সুষম বণ্টন হতে পারে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয়ের হ্রাস ঘটবে ফলে আয়গত বৈষম্য দেখা দেবে। সেজন্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণে উন্নততর এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগ করলে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়বে।

বাজার অর্থনীতিতে দারিদ্র্য সীমারেখা মুছে যাবে না। তাই ভূমি সংস্কার এবং গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে সহনশীল উন্নয়নই হলো দারিদ্র্য মোচনের চাবিকাঠি। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভূমি আইনের সংস্কার সাধন করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে আয়ের অসমতাও দূর হবে।

www.pathagar.com

২. দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা যে সকল অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগ করেন সে সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সকল দ্রব্যের সাধারণ বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

৩. অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যুৎ, পানীয়জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব। ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে ও আয়গত অসমতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে থাকবে।

৪. গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও শিল্পব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয় তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বাস করে তাই গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন দ্রুতগামী করে দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব। তাছাড়া স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি মারফত আয় বাড়াবার ব্যবস্থা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য সংকোচন সম্ভব।

৫. শহর ও গ্রাম ভিত্তিক নিযুক্তির জন্য সরকারেরও নীতি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সাবলীল করতে হবে। শিল্প-কলকারখানা ও মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নিয়োগও বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে আয়ের বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পাবে।

৬. উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারের একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারি কর বা রেহাই মূল্য পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে যাতে দেশের অধিকাংশ মানুষ এর সুবিধা লাভ করতে পারেন। জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষতিও স্বীকার করতে হবে। তাই দরিদ্রের স্বার্থে ভর্তুকি থাকা বাঞ্ছনীয়, তখনই আয়ের সুষম বণ্টন সম্ভব হবে।

৭. আয়ের বণ্টনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মজুরি নীতি থাকতে হবে। শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মজুরিনীতি নির্ধারণ করে একচেটিয়া ব্যবসার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ সঠিক ও কঠোর করতে হবে। দেশে আয় কতিপয় মানুষের হাতে না গিয়ে বরং সব শ্রেণীর মানুষের হাতে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে আয়গত অসমতা দূর হবে।

www.pathagar.com

৮. বিগত কোনো কোনো সরকারের আমলে দরিদ্রর জন্য সরকারি কর্মসূচি নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল, এখনও হচ্ছে কিন্তু তখন বাজার উন্নত ছিল না কিন্তু এখন বাজার অনেক উন্নত। সুতরাং এখন গরিব মানুষকে বাজারের জন্য তৈরি করে দেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ বিরাট সংখ্যক গরিব লোকের বাসভূমি ও পৃথিবীর ১৭৪টি গরিব দেশের মধ্যে এর স্থান ১৫৮ নম্বরে। এটি খুবই বেদনাদায়ক বার্তা। কাজেই বাংলাদেশের রাষ্ট্র নেতাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হওয়া উচিত কৃষি ও কৃষিজীবী সম্বন্ধে যথাযথ পরিসংখ্যান নির্ণয়, দারিদ্র্য সীমারেখার যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ, কোনও ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারীর সংখ্যা কৃত তা নিরূপণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া। যদি তা না হয় তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং জাতীয় স্তরে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য জনপ্রতি আয় বা জিডিপি-এর হিসাবের চেয়েও এখন প্রধান প্রয়োজন সেসব অঞ্চল ও শ্রেণীগুলোকে চিহ্নিত করা যেগুলো দারিদ্র্য কবলিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এরপর এদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেদিকে কঠোর নজরদারি করা যাতে প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে হিতাধিকারীদের উন্নয়ন সুনিশ্চিতকরণে ব্যয় হয়। প্রকল্প রূপায়ণের পরবর্তী স্তরে এটির ফলাফলে সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। রয়েছে পরবর্তী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সে জন্যই বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের আগাম ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশ্রুতিকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছে, ক্ষুধা নিরসনের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ যদি এখনও সুনিশ্চিত করা না হয় তবে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া আরও প্রসারিত হবে এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতিকেই বাধাগ্রস্ত করে তুলবে। প্রতিকারের প্রথম স্তর হিসাবে তারা পরামর্শ দিয়েছে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আনয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন বাস্তব সম্মত অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং কৃষি ও গ্রামের উন্নয়ন ঘটানো। আমরা চোখের সামনে দেখছি আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রীর অসম বিতরণ ব্যবস্থা যেমন দায়ী তেমনি গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অভাবও সমভাবে দায়ী। অথচ দেশে গ্রামোন্নয়নে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও গ্রামগুলোর অবস্থার তারতম্য

www.pathagar.com

কেন ঘটছে না সে অনুসন্ধানের প্রয়োজন কেউই অনুভব করছে না। গ্রামোন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকায় কোন কাজে ব্যয় করা হচ্ছে সেটি নির্ণয় করা এখন আবশ্যক। অন্যথায় সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা বিশেষত গ্রামীণ জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে পারে এবং তাদের বিদ্রোহ শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত নিরুদ্বিগ্ন গণনাই বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরিকরণ প্রকল্প চিরকাল ফলপ্রসূ হবে না এ ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য পরিবর্তন আনতে গেলে সরকার গত ৩৭ বছরে যেসব নীতি মেনে চলেছে, তার আমূল পরিবর্তন দরকার। আমাদের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে গণতন্ত্রের বিকাশ। পরিকল্পনা ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে আজকের চেহারায় দেখা যেত না। দারিদ্র্য দূরিকরণ প্রকল্প আমাদের পরিকল্পনারই দান। মার্কিন মদতে বাজার অর্থনীতির পথে হাঁটলে গণতন্ত্র টিকবে না। পশ্চিমী ধাঁচে সামগ্রিক উন্নয়নের চিন্তা কল্পনা বিলাস মাত্র। তাই নিজেদের সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে, রয়েছে সম্ভাবনাও। দরকার শুধু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা এবং চেষ্টা। এ ব্যাপারে অবশ্যই সরকারেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : নিরসনের সন্ধানে

বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করার পূর্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কাকে বলে তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির সহজ অর্থ, টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়া। 'মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে স্বল্প জোগানের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত চাহিদা রয়েছে।' মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হলো অত্যধিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যের অস্থিতিস্থাপক জোগান। ভোগ, উৎপাদন এবং অর্থের জোগানের মধ্যে অসমতার দরুন মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি না করাই খাদ্য সমস্যার প্রধান কারণ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেশের কৃষিজমির উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমিত জমি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টিত হতে হতে জমির একক মালিকানা থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে। এতে কৃষি

www.pathagar.com

মুনাফাহীন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ, অথচ মোট কৃষিজমির ষাট শতাংশই এখনও পানিসেচের আওতার বাইরে। আমাদের দেশে কৃষি ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত প্রকৃতি নির্ভরশীল। কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যাজনিত কারণে গেল ক'বছর চালের উৎপাদন ছিল কম।

কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জ্যাবস দিয়ফ তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, সারা বিশ্বের মজুদ ভাণ্ডারে এখন চল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য রয়েছে, যা পৃথিবীতে মানুষের মাত্র দু'সপ্তাহের খোরাক হতে পারে। এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিকাংশ দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মার খাচ্ছে। এতে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক বাড়ছে। সেহেতু সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে। খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্যের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। দেশটিতে এখন মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ১০ শতাংশ। তাই দেশে 'নীরব দুর্ভিক্ষ' চলছে। ধুকে ধুকে মরছে মানুষ।

বর্তমানে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া দেশের মানুষ মোটেই সুখে নেই। যাদের দিনান্তে পান্তা ফুরোয় তারা ক্রমশ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছেন, কোনো আলো নেই—কেবল অন্ধকার। সামান্য আয়ের লোক, দিনমজুর, প্রান্তিক কৃষিজীবী—তাদের আয় মোটেই বাড়ে নি অথচ খরচ বাড়ছে হু হু করে। নিম্নবিত্তদের জন্য ডাল-ভাতের সংস্থান করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। ১৫ কোটির এ দেশের দারিদ্রসীমার নিচের বিপুল সংখ্যক মানুষ শুধু নয়—মধ্যবিত্তদের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে উঠে গেছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বসীমা। জিনিসের দাম শুধু বাড়ছে, কেনা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ সত্যি আজ দিশেহারা। আন্তর্জাতিক স্তরে নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যে ঘটছে, তা সত্য। এসব যুক্তিতর্ক শুনিয়ে কারো পেটের জ্বালা নিবৃত্তি করা যায় না। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতে, খাদ্যশস্যের এ সঙ্কট আগামী তিন-চার বছর অব্যাহত থাকবে। পেটে গামছা বাঁধা ছাড়া গরিবের আর কোনো উপায় নেই। এদিকে দুস্থদের জন্য কার্যকর গণবণ্টন ব্যবস্থা দুর্নীতির করাল গ্রাসে আবদ্ধ।

বিভিন্ন তথ্যমূলক বিশ্লেষণ থেকে এটি পরিষ্কার যে জিনিসপত্রের দাম কেন অনবরত বেড়ে চলছে? মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলো কি? সেগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

www.pathagar.com

১. সাধারণত প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং জোগান হ্রাসজনিত কারণগুলো এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তাছাড়া একদম খাঁটি সত্য হচ্ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে, গত কয়েক বছরে ফলে এ দুর্ভোগ। মুক্তবাজার অর্থনীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদির যাঁতাকলে গুরুত্ব হারিয়েছে কৃষিক্ষেত্র। বাজেট তৈরির আগে অর্থমন্ত্রী শিল্প জগতের প্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা এবং সুধীমহলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ পান না বা প্রয়োজন অনুভব করেন না। কৃষিঋণ মওকুফের কথা ঘোষণার পর কৃষকদের বহু ক্ষেত্রে তা হয় নি। মহাজনী ঋণ মেটাবে কে? এ নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরো একটি কারণ, অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় মার্কিন ডলারের মূল্যে ঘাটতি। ডলারের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, অথচ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয় তাই ওরা তেলের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

৩. দেশে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর পরিমাণে কালো টাকা সৃষ্টির ফলে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে এক শ্রেণীর মুনাফালোভী ব্যবসায়ীর অতি লোভ মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাছাড়া মজুতদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে দ্রব্যমূল্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে সামগ্রিক চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্যাদির জোগান সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি। স্বভাবত এর ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জোগানের দিকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি।

৫. রপ্তানি প্রসারের দরুন বিভিন্ন দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ জোগান হ্রাস পায়। তাছাড়া আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের ভোগ্য দ্রব্যের জোগানও হ্রাস পায়। সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু ভুল পদক্ষেপ শুরু থেকে দেশের মূল্যবৃদ্ধি এবং তৎসম্পর্কিত টাকার মূল্য হ্রাসকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, ভোট ব্যাংককে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পূর্বেকার সরকারগুলো নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ সমাধান করা হয় কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয় নি।

www.pathagar.com

৬. প্রতি বছর বাজেটে অত্যধিক পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের দরুন জনসাধারণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামালের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বভাবত এ সময় মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া অলাভজনক খাতে ব্যয় মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়া তথা পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে জনসাধারণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করার পর যে ফলাফল দেখা দিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. বিশ্বের তেত্রিশটির বেশি দেশে খাদ্য, জ্বালানির তীব্র সঙ্কট চলছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবিতে মিয়ানমার, ফিলিপাইন, হাইতি, মিশরসহ আরো কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে সহিংস বিক্ষোভ এবং সরকারি খাদ্য গুদামে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকার নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। বাস্তবে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়া হলেও ফললাভ প্রায় সম্ভব হচ্ছে না। উৎপাদন বা সরবরাহ চাহিদামতো হলে এ মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এতে মুদ্রাস্ফীতিও বাড়ে। এ অবস্থায় জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, শিগ্‌গির খাদ্যপণ্যের সংকটের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে, অন্যথায় দেশগুলোতে যে কোনো সময় গণ-অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

ভারতের মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ ও অন্ধ্রে কৃষকেরা গণহারে আত্মহত্যা করছেন কারণ দারিদ্র্য, অভাব পরিবার পরিজনদের ক্ষুধার্ত চেহারা দেখার যন্ত্রণা আর ঋণের চাপ। সাধারণ মানুষের হাল-হকিকত যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকদের আত্মহননের পথ বেছে নিতে হচ্ছে। তাই সরকার যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাগলা ঘোড়ার মুখে এক্ষুনি লাগাম না পরাতে পারে তবে এ ক্রোধ, ক্ষোভ কিন্তু বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ-শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীরা আত্মহননের পথে না গিয়ে হয়ত সরাসরি আন্দোলনে যাবে যা হবে বড় বিপর্যয়।

খ. সরকার চাপে পড়ে কিস্তিতে কিস্তিতে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। এ হিসাবে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছে না। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যখন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন তিনশো থেকে হাজারের মধ্যে ছিলো তখন দেশে চালের কেজি ছিল দু'টাকা। ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম ছিল কেজি প্রতি পাঁচ থেকে পনেরো টাকার মধ্যে। আজ সেখানে একজন কর্মকর্তার দশ থেকে পনেরো-বিশ, এমনকি পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা মাইনে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম। ষাট দশকের দু'টাকা কিলো দরের চাল আজ ১৫ গুণ বেড়ে ৩০ টাকা। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন দশগুণের বেশি বেড়েছে। এখন দ্রব্যমূল্য জোর করে কমিয়ে যদি ষাট-সত্তরের দশকের অবস্থানে নিয়ে আসা যায় তবে সঙ্গতি বা ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এ হারকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

গ. এখন সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে বাজার আর ব্যবসা-বাণিজ্য। এখন মূল্য যদি এতটা বৃদ্ধি পায় যে ক্রেতারা কিনতে না পারে তবে বিক্রেতারা কার কাছে পণ্য বেচবে? ব্যবসাও মার খাবে। তাছাড়া চোখের সামনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার থাকতেও যারা ক্রয় করতে পারছে না তারা কতদিন আর হাত গুটিয়ে ক্ষুধা আর অভাব সহ্য করবে? তাই একসময় ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। সবকাজে এখনই সচেতন হতে হবে। ক্রমাগত দামস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা

১. বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করার ব্যবস্থা করা ও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করা, তৎসঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় আইন প্রয়োগ করে খাদ্যশস্য মজুদ নিষিদ্ধ করা এবং খাদ্যশস্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা।

২. মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকারের উচিত বেশ কিছু দ্রব্যসামগ্রীর উপর থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা। তৎসঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করা পাশাপাশি মজুতদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন ও পুরাতন মুদ্রাগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেমন—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রক্ষিত জমার অনুপাত বৃদ্ধি করা। ব্যাংকের বাট্টার হার বৃদ্ধি করা, বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করা ইত্যাদি।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সত্যি বলতে কি এ বিভাগে যে কাজ হয় তা শুধু কাগজে কলমে বাস্তবে ফল লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। তথ্য ও বাস্তবে ফারাক প্রচুর। কথা ও কাজে বেমিলতো আছেই।

২. ভূমি সংস্কার নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রতি জেলায় একটি খাদ্যাঞ্চল গঠন করা। কৃষকগণ যাতে খাদ্যশস্যের ন্যায্য মূল্য পান সেজন্য খাদ্যশস্যের দামের স্থিরতা আনয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। খাদ্যশস্যের দামের স্থিরতা আনয়ন করতে পারলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য এবং খাদ্যের যথোপযুক্ত বণ্টনের নিমিত্ত খাদ্য ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. কৃষি হলো দেশের ভবিষ্যৎ। সেহেতু দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কৃষিভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কৃষকরা যাতে সময়মতো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ পায় তার লক্ষ্যে কৃষকদের জন্য ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া। বাস্তবে ব্যাংক থেকে কৃষিঋণ পাওয়া চাষীর সংখ্যা হাতেগোনা। যারা সত্যি সত্যি কৃষক এবং যাদের ঋণের প্রয়োজন তাদের অনেকেই নানা রকম হয়রানি ও ঝামেলার জন্য ব্যাংকে ঋণ নিতে যায়ই না এতে কৃষকদের সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। ফলে কৃষিঋণ মওকুফের ব্যাপারটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। গণহারে কৃষিঋণ মওকুফের ব্যাপারটি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, এর পরিণামে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ঋণ মওকুফ আসলে কৃষকদের সমস্যার কোনো সুরাহা নয়। মাইক্রোফিনান্স এবং ঋণ প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করার মধ্যে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হবার পর একে একে ৩৭টি বছর চলে গেল। স্বাধীন করার ব্যাপারে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে, স্বাধীনতার ৩৭ বছরেও এর সুফল আমরা গরিব জনতার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি নি। তাই শুধু বৈঠক, সভা-সমিতি, বিবৃতি-প্রচার অথবা রাজনৈতিক মুনাফামুখী আন্দোলন নয়—সমস্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতা, চিন্তাবিদ, মেধাবী অর্থনীতিবিদ আর দেশপ্রেমীদের উচিত অনতিবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণগুলোকে চিহ্নিত করে এগুলোকে অচিরে নির্মূল করা আর সেটা করতে হবে অবিলম্বে-যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। বেকার অভাবগ্রস্ত মানুষের ওপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপ প্রতিহত করা না গেলে সারা দেশের জন্যই যে দুঃসময় সমাগত তা সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। এখন সময় এসেছে বিশ্বময় খাদ্য সংকট নিরসনের জন্য সারা পৃথিবীর দেশগুলোর উদ্যোগে এক উপায় এবং পন্থা নিরূপণ করার। বিশ্বে খাদ্য বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল গত শতকের ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশও এ উদ্যোগের অন্তর্গত ছিল। এখন তাই দরকার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের। এজন্য গবেষণা বিশ্বময় স্তরে হওয়া দরকার অধিক উৎপাদনক্ষম বীজ আবিষ্কারের ও সরবরাহের জন্য।

তিব্বতের পাহাড়ে রেললাইন : আশ্চর্যজনক হলেও সত্য

১ জুলাই ২০০৬ সালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির ৮৫তম জন্মদিন পালিত হলো। সেদিনই ৪৪ বছর পর নাথুলা পাসের দরজা খুলে গেল আবার। চৈনিক ও মার্কিন প্রযুক্তিতে গড়ে ওঠা কিনঘাই-তিব্বত রেলপথের শুভ মহরৎও সেদিনই হলো। তার কদিন পর ৬ জুলাই দালাই লামার ৭১ তম জন্মদিন ছিল। দলাই লামা একসময় কিনসাই তিব্বত রেলপথের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনেক বছর পর তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তব হলো। তিব্বতের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া এবং বাইরের জগতের দরজা খুলে গেল। আর বোধহয় তিব্বতকে 'নিষিদ্ধ ভূমি' বলা যাবে না। সেখানকার মানুষেরা বেশ উত্তেজিত ও আনন্দিত স্বাভাবিকভাবেই। উত্তেজনা ও সন্দেহ বিভিন্ন দেশগুলোর রাজনৈতিক মহলেই রয়েছে।

পেছনে ঘুরে দেখলে জানা যায় ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস, বাংলার গভর্নর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সিখাস্ত অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের বাণিজ্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে জানা যায় নি। এরপর বিংশ শতকের প্রথমে ১৯০৩-০৪ সালে কর্ণেল

www.pathagar.com

ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড ইয়ংহাজবেন্তর প্রচেষ্টায় অবশেষে ইঙ্গো-তিব্বত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবেই ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ শুরু হয়। ১৯১৯ সালে সুন ইয়াৎ সেন তাঁর 'প্ল্যানস ফর ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' বইয়ের কিনঘাই-তিব্বত রেলপথ গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা লেখেন। ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ সালে রেলপথ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তখন চীনের জাতীয় শক্তি ও আর্থিক শক্তি কোনোটাই এত উন্নত ছিল না। কিন্তু তার জন্য ভারত-চীন সীমান্ত বাণিজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৫৪ সালে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তি। কিন্তু ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সে চুক্তির দ্রুত কার্যকারিতা শেষ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে রেল মন্ত্রণালয় লাসকু থেকে লাসা ২,০০০ কিলোমিটার অঞ্চল সমীক্ষা করে রেললাইন বসানোর জন্য। ১৯৫৮ সালে কিনঘাইয়ের রাজধানী সিনয়িং থেকে কিনঘাইয়ের পশ্চিমে গোলমুঙ্গ পর্বত রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬০ সালের আবহাওয়াজনিত প্রতিকূলতার জন্য কাজ বন্ধ হয়। আবার কাজ শুরু হলেও ১৯৭৮ সালে অত্যধিক শীত ও অপ্রতুল অক্সিজেনের কারণে কাজ আবার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতেই ১৯৮৪ সালের ১ মে কিনসাই-তিব্বত রেলপথের পশ্চিম অংশের ব্যবহার সরকারিভাবে শুরু হয় যায়। এরপর ২০০১ সালের ২৯ জুন গোলমুদ ও লাসা অঞ্চলের রেল নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। রেল চলাচল শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০০৭ সালে, কিন্তু তার এক বছর আগেই কিনসাই-তিব্বত রেলপথ দিয়ে রেল যাতায়াত সাফল্যের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল।

১৫০০০ ফুট উচ্চতায় ভারতের সিকিম এবং চীনের তিব্বত অঞ্চলের সীমান্তে নাথুলা অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ৫২ কিলোমিটার বা ৩৩ মাইল। আর কিনঘাই তিব্বত রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১,৯৫৬ কিলোমিটার। বেজিং থেকে লাসার দূরত্ব ৪০০০ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে ৪৮ ঘণ্টায় বেজিং থেকে লাসায় পৌঁছোনো যাবে। যাওয়ার পথে একটি সেতু পড়বে, যার নাম সানচাহে সেতু, গোলামুদের কাছে। এ রেলসেতু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলসেতু। গোটা রেলপথটাই সমুদ্র স্থান থেকে ৪০০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত এবং অধিক উচ্চতা হলো ৫,০৭২ মিটার, অ্যান্ডস-এ পেরুভিয়ান রেলপথ থেকে ২০০ মিটার বেশি। নাথুলা পাস শুধু ভারত ও চীন নয়, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্তকেও ছুঁয়ে গেছে। লাসা থেকে নাথুলার দূরত্ব ৪৬০ কিলোমিটার, কলকাতা থেকে দূরত্ব ৫৫০ কিলোমিটার, ভুটানের রাজধানী থিম্পু থেকে এর দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটার ও ঢাকা থেকে দূরত্ব ৬০০ কিলোমিটার।

www.pathagar.com

কিনঘাই-তিব্বত রেলপথ গড়ে তোলার আগে ১৯৫৪ সালে গড়ে ওঠা কিনঘাই-তিব্বত সড়কপথ ছিল ওই অঞ্চলের জীবনরেখা। ২০০৫ সালের মধ্যে ওই অঞ্চলে ৪৩, ০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক পথ গড়ে ওঠে। ২০১০ সালের মধ্যে এটাকে ৫০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২,০৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কিনসাই-তিব্বত রেলপথ গোবি মরুভূমি এবং বরফাবৃত পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রাস্তা ৫,২৩০ মিটার উচ্চে অবস্থিত, যাকে 'জীবন শূন্য' অঞ্চল বলা হয়। এ রাস্তা ট্যাঙ্গুলা পর্বতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ সড়কপথে সমান্তরালভাবে কিনঘাই-তিব্বত রেল লাইন বসানো হয়েছে।

১.২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত তিব্বতের ২.৬ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে এ রেলপথ নিঃসন্দেহে জীবনরেখা। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশির ভাগই ট্রেন কোনও দিন দেখেনি। তাই এদের মধ্যে সহজেই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র 'অপু' ও দুর্গাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ রেলপথ নিয়ে নানারকম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ আবার ট্রেনে চড়ে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ট্রেন নিয়ে তাদের মধ্যে জমে থাকা নানা স্বপ্ন, কল্পনার শুরু হয়েছে ১ জুলাই ২০০৬ সালে কিনঘাই-তিব্বত রেলপথ চালু হওয়ার ফলে।

এ রেলপথের নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় প্রভাবই রয়েছে। অনেকে মনে করছেন এ রেলপথ দিয়ে ট্রেন যাওয়ার সময় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ক্রমশ তা ভেঙে যেতেও পারে। তিব্বতি ও বিদেশী সমালোচকদের মতে এ রেলপথ তিব্বতের পরিবর্তে জাভা চৈনিকদের জন্য বেশি লাভজনক। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের অর্থনীতিকে বিকশিত করবে এবং তিব্বতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক কৃষ্টি সংরক্ষণে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করবে। স্বাভাবিক পরিবেশকে বিধ্বস্ত করবে। বেশির ভাগ তিব্বতির মতে রেলপথ প্রবর্তনের ফলে তিব্বতের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক বেশিসংখ্যক চৈনিকের অভিবাসন হবে। তিব্বতিদের পক্ষে বেশি লাভজনক হবে না। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ, তিব্বতের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করাই এ রেলপথ গড়ে তোলার প্রধান কারণ। এছাড়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ তিব্বতের খনিজ সম্পদ শোষণ করাও এর ফলে সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

সমালোচকরা যাই বলুক না কেন এর ইতিবাচক প্রভাবগুলো কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ নাথুলা পাসের পুনরায় উন্মুক্ত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র চীন তিব্বত নয় ভারত-চীন বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হবে। ১৯৯০ দশকের প্রথমদিকে সে সীমান্ত বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ নাথুলা পাসের মধ্যে দিয়ে হয়েছিল। তিব্বত স্বয়ংক্রিয় অঞ্চলের ভাইস চেয়ারম্যান হাও পেং-এর মতে, এ রেলপথ প্রবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান হবে এবং বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্মাণ শিল্প ও পরিসেবা শিল্পও গড়ে উঠবে আশা করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে ভারত ও চীন নাথুলা পাসে বাণিজ্য পুনরায় চালু করার জন্য সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে। চাইনিজ স্টেট কাউন্সিল ইয়াদং কাউন্টিতে সীমান্ত বাণিজ্য গড়ে তোলার সম্মতি দেয়। চীন ও ভারত ২০০৫ সালে রেকর্ড মার্কিন ১৮.৭৩ ডলার মূল্যে বাণিজ্য সম্পাদন করেছিল, যা পূর্ববর্তী বছরের থেকে ৩৭.৫ শতাংশ বেশি। এ বছর তা মার্কিন ২০ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পাবে মনে করা হচ্ছে।

নাথুলা পাস থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে শেরাথাং গ্রামে বাজার তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এখানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, দূরসঞ্চার ব্যবস্থা, সাইবার ক্যাফে সবকিছুই গড়ে তোলা হয়েছে। একসময় নাথুলা ছিল প্রধান সিল্ক পথ। সে পথ দিয়ে ভারত বর্তমানে ২৯টি পণ্য বিনা শুল্কে রপ্তানি করতে পারবে। যেমন কাপড়, শাল, কৃষিকাজের জিনিসপত্র, মদ, সিগারেট, চা, বার্লি, চাল, ভেষজ তেল, ইত্যাদি এবং চৈনিক বণিকেরা ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, ইয়াকের লেজ, ইয়াকের চুল, ছাগলের চামড়া ইত্যাদি ১৫টি পণ্যে এ সুবিধা পাবে। এ ১৫টি পণ্যের মধ্যে সে বিখ্যাত চিনাংশুক বা চীনের সিল্ক স্থান পায়নি।

এখানে বাণিজ্যের সময় ঠিক করা হয়েছে ১ জুন থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর কারণ অন্যান্য সময় এ স্থান অত্যধিক তুষারপাতের ফলে যাতায়াত অযোগ্য হয়ে যায়।

চৈনিক কর্মকর্তাদের মতে, এর ফলে পর্যটন রাজস্ব দ্বিগুণ বাড়বে এবং মালামাল পরিবহনের ব্যয় তিন চতুর্থাংশ কমে যাবে। পর্যটন শিল্প বাড়লে তিব্বতের মঠগুলোর সমৃদ্ধি বাড়বে। কারণ ২০০৫ সালের জোখাং মঠে টিকিট বিক্রি থেকে রাজস্বের পরিমাণ বছরে ১০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। তাই রেল প্রবর্তন পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করলে তা মাঠের অবস্থা ও সেখানকার মঠবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশ ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ একে অপরের সহায়ক হবে। এ দীর্ঘ রেলপথের

www.pathagar.com

কাছাকাছি ৩০০ মঠ আছে যার মধ্যে কিছু কিছু জনগণের জন্য খুলে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

অনেকেই ভেবেছিলেন যে এ রেলপথ প্রবর্তনের ফলে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কিনঘাই তিব্বত রেলপথের কর্মকর্তারা পরিবেশ রক্ষার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছেন। ন্যাশনাল অডিট আর্মস থেকে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় পরিবেশ রক্ষার জন্য ১.৫৬ বিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এ বছর রেলের সহমন্ত্রী সান ইয়ংফুকে 'চায়না এনভায়রনমেন্ট' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এর ফলে সেখানকার মানুষ পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে ভয়মুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিও এগিয়ে এসেছে পরিবেশ রক্ষার জন্য। একটি কোম্পানিকে নদীতে বর্জ্য পদার্থ ফেলার অপরাধে ৫০০০ ইয়েন জরিমানা করা হয়েছে।

তিব্বতে গ্রীষ্মকালে বরফ গলতে থাকে আর সে বরফ গলা পানি কৃষিতে ব্যবহার করা হয়। শীতকালে তুষার পাতের পানি ধরে রাখা হয়। কিন্তু রেল চলার ফলে যে উত্তাপ নির্গত হবে তার ফলে বরফ তাড়াতাড়ি গলার সম্ভাবনা থাকবে, এর ফলে পানির অভাব হবে, যা ওই রেল অঞ্চলের কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই রেললাইনের পাশে রেডিয়েটার বসানো হয়েছে যা উত্তাপ নির্গমনের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষিত হবে।

সর্বোপরি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নাথুলা পাস উন্মুক্ত হওয়ার ফলে উভয় দেশের মধ্যে শান্তির আবহাওয়া গড়ে উঠবে আশা করা যায়। অধ্যাপক লিউয়ের মতে, উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় ২০০৬/০৭ সালকে চীন-ভারত বন্ধুত্বের বছর হিসেবে পালন সার্থকতা লাভ করবে দূর ভবিষ্যতে।

খতিয়ে জানা যায় এশিয়ার দেশগুলো অনেকদিন থেকেই নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিভিন্ন রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। একদিকে তাই সার্ক, আশিয়ান, বিআইএসটি-ই সি বিভিন্ন চুক্তি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সীমান্ত রক্ষার লড়াই বজায় রেখে বিভিন্ন সীমান্তের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকে শুরু হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ভারত-বাংলাদেশ বাস চলাচলের প্রথম দৃষ্টান্ত। এরপর ২০০১ সালে ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে

www.pathagar.com

দিল্লি-লাহোর বাস চলাচল শুরু হয়। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে অমৃতসর-লাহোর 'শান্তি বাস' চলাচল করছে। ওই বছরের জুন মাসে পুঞ্চ রাওয়ালকোর্ট পর্যন্ত অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগের উদ্বোধন করা হয়েছে।

কিছুদিন পর চীনের হিউ জিনটাও এবং পারভেজ মুশাররফ গিলগিট এবং সিনজিয়াং-এর কাশগারের মধ্যে দিয়ে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া নেপাল-চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কাঠমাণ্ডু থেকে লাসা বাস চলাচল শুরু করার জন্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নাথুলা পাসের উদ্বোধন এ ধারারই এক অনবদ্য সংযোজন। তবে কিনসাই-তিব্বত রেলপথ তিব্বতের মানুষদের জীবনে ক্রমশ যে নতুনত্বের, আধুনিকতার স্পর্শ এনে দেবে তা পরবর্তীকালে তিব্বতের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা এনে দেবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গেই তিব্বতের যোগাযোগ অনেক সহজ হবে তুলনামূলকভাবে। তিব্বতকে 'পৃথিবীর ছাদ', 'পৃথিবীর তৃতীয় মেরু' যাই বলা হোক না কেন এখন থেকে এ তিব্বতকে 'নিষিদ্ধ ভূমি' কি আর বলা যায়?

চীন ভারত সম্পর্কে যুগপৎ সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব

পর্যবেক্ষকদের মতে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যের দিকে ক্ষমতা ও শক্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া ক্রমশ জোরদার হচ্ছে এবং এ পথ ধরেই বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামো নতুন রূপ নিতে চলেছে। এ পৃথিবী নামক গ্রহের দুই বিশাল জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশ ভারত ও চীন এখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখলের দৌড়ে রয়েছে এবং বিশ্বে নতুন পরিচিতিতে জায়গা করে নিতে নীরবে এগোচ্ছে। জাপান এখন তার সামরিক স্নায়ুশক্তিকে ক্রমে নমনীয় করে তুলেছে এবং ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকটের দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার পর দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অর্থনীতি এখন ব্যবসা নির্ভর হয়ে উঠছে। এতসব আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা থাকা এবং কোরিয়ান উপদ্বীপ, তাইওয়ান ও কাশ্মীরে প্রত্যাহান থাকার পরও এটা স্পষ্ট যে সব মিলিয়ে এ শতাব্দী 'এশিয়ার শতাব্দী' হিসেবে পরিচিত হতে চলছে।

এক্ষেত্রে চীন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের উপরই নির্ভর করছে এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ। বিশ্বের এ প্রবণতার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিষদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকসমূহে চীন ও ভারতে এ

www.pathagar.com

উত্থানজনিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। চীন ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই এশিয়ায় তথা বিশ্বের নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোর সীমারেখা গড়ে তোলার নিয়ন্ত্রক হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও তার একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা যখন করমর্দন করব, সারা বিশ্ব তখন তাকিয়ে দেখবে।'

যাই হোক, ঠিক আজকের মতো চীন-ভারত সম্পর্কের কালো কক্ষপথ হয়ত চিরদিন জটিল থেকে যাবে। যদিও সহযোগিতা কিংবা সংঘর্ষ যে বাতাবরণ যখন তৈরি হাক না কেন চীন-ভারত সম্পর্ক নির্ণয় করবে তাদের নিজ নিজ প্রতিপত্তি অর্জনের ভিত্তিভূমি এবং একে অন্যের রণকৌশলের ক্ষেত্র।

অবশ্যই ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ চীনকে ভারতের এক নম্বর শত্রু এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লেখা চিঠিতে চীনের প্রস্তাবিত হুমকির প্রত্যুত্তরের ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বলে উল্লেখ করার পর নদী দিয়ে প্রচুর পানি গড়িয়ে গেছে। তখন থেকে দু'পক্ষ পেরিয়ে এসেছে দীর্ঘপথ। এ দশকের মধ্যে প্রথম একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২০০৩ সালে চীন সফরে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে বলা চলে উল্লম্ফন ঘটিয়েছে। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, অতীতের কিছু তিক্ত ঘটনা সত্ত্বেও চীন ভারতের কাছে মোটেই এখন হুমকিস্বরূপ নয়। ২৭ বছরের পুরোনো সীমান্ত বিতর্ক সমাধানের জন্য দু'দেশ বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করল। প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হলেন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক স্তরের মধ্যস্থতাকারী। ভারতকে মেনে নিতে হলো তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার এবং এ দেশে কোনো অবস্থাতেই চীন-বিরোধী কোনো তৎপরতা মেনে নেয়া হবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো ভারত। অপরদিকে চীনও মেনে নিল ১৯৭৫ সালে সিকিমের ভারতে অন্তর্ভুক্তি। একই সাথে উভয় দেশই সিকিম সীমান্তে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তুলতে সম্মত হলো। পরবর্তীতে সিকিমকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখিয়ে সংশোধিত মানচিত্র প্রকাশ করল চীন। ভারত ও তিব্বতকে চীনের অংশ দেখিয়ে প্রকাশ করলো সংশোধিত মানচিত্র।

২০০৪ সালে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের পর ভারত সরকার এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করার সংকল্প নিয়ে কাজ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। জাতির প্রতি প্রদত্ত প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গভীরতর করার ঘোষণা দিলেন। ফলে দ্বি-পাক্ষিক

www.pathagar.com

বাণিজ্যের মাত্রা ১৯৯১ সালে যখন ছিল মাত্র ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়াল ৩৬ বিলিয়ন ডলারে। এছাড়া দু'দেশ চলতি বছরের শেষ দিকে একটি সুসংহত অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সমঝোতা এবং বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করার দিকে এগোচ্ছে।

উভয় রাষ্ট্র এখন সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছে। দ্বি-পাক্ষিক সেনার অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিয়েও উচ্চপর্যায়ে সমঝোতা হয়েছে, যা ক' বছর আগেও ভাবনার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। প্রথমে পদক্ষেপ হিসাবে চীনা ও ভারতীয় নৌবাহিনী যৌথ অনুসন্ধানমূলক অভিযান এবং উদ্ধার অভিযান চালায় ২০০৭ সালে নাংজাই উপকূলে। উভয় রাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতে চাইছে। এ উদ্দেশ্যে সাংহাইয়ের কাছে প্রেসারাইজড ডেভি ওয়াটার রি-অ্যাক্টের ব্যবহারের জন্য চীন ভারত থেকে হেভি ওয়াটার আমদানি করার পরিকল্পনা করছে।

এতসব সত্ত্বেও বহু পর্যবেক্ষক পাকিস্তানের দিকে চীনের নেক নজর নিয়ে কথা বলেন। কার্গিল যুদ্ধের সময় চীনের নিরপেক্ষ ভূমিকা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কারো পক্ষ সমর্থনে বিরত থাকা এবং নতুন দিল্লীতে সংসদ ভবনে উগ্রপন্থী হামলার মতো সংকটের সময় পাশে থাকা ইত্যাদি ঘটনা ভারতের প্রতি চীনের আন্তরিক সৌহার্দ্যের প্রমাণ এবং দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখারই নিদর্শনস্বরূপ। এছাড়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পাকিস্তানকে নানাভাবে উৎসাহিত করে যাচ্ছে চীন। আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্য মাথায় রেখে চীনের এসব প্রয়াস। একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ও শান্তির স্বপক্ষে কার্যকলাপে সহযোগি হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে চীনও এগিয়ে এসেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। এমন অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

কিন্তু চীন-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এতসব সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে কেন্দ্রপসারি রণকৌশলের এক অন্তঃসলীলা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চীন তৎপরতার সঙ্গে ভারতকে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে উত্থানে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ কঠিন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় চীন আপন প্রভুত্ব কায়েম করার লক্ষে বিশেষ চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে হাতে রেখে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক অটুট রেখে কাজ হাসিল করতে চাইছে চীন।

www.pathagar.com

ভারতের সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারসাম্য গড়ে তোলার জন্য চীন পাকিস্তানের পারমানবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ব্যাপারে লাগাতার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি ভারতকে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করবে। সে সুযোগ চীনের এশিয়ার তথা বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হবে। সর্বোপরি কাশ্মীর বিরোধে ভারতের সঙ্গে সহমতে না গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেতে চাইছে না চীন—এটা লক্ষণীয়। ভারত-পাক শান্তি আলোচনায় অগ্রগতিতে যে বার বার কোনো রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা ডেকে আনছে চীন, পাকিস্তান রণকৌশলজাত সম্পর্ক অবশ্যই তার অন্যতম কারণ।

অপরদিকে, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও চীন সন্দেহকাতর। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ভারত বৃহৎ শক্তি অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে পারে—এটা বুঝতে পেরে চীন এশিয়ায় তার নিজস্ব রণকৌশল গড়ে তুলতে চলেছে। যেহেতু ভারত ও চীন এশিয়ায় দু'টি প্রধান শক্তি, এতে বিশ্বের নানা রাষ্ট্র নানা আশা আকাঙ্ক্ষা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জড়িত। তাই এ দু'রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা এড়ানো যাবে না। এখন এ-দু আঞ্চলিক বৃহৎশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতা যেরূপ পরিগ্রহ করবে তাতে নির্ভর করবে এশিয়ার ভবিষ্যৎ যা হবে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব রাজনীতির সঞ্চারপথ।

সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদ : উৎস ও সমাধান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২৮ মে ২০০৮ বুধবার কলোরোগতে মার্কিন বিমান বাহিনী একাডেমীর নতুন গ্র্যাজুয়েটদের কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠানে দেয়া এক ভাষণে বলেন, ইরাক ও আফগানিস্তানে ইসলামী চরম পন্থার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে তুলনা করেন।

বুশ আরো বলেন, আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌছে আবারো আমরা এক মতাদর্শের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি যা ক্ষোভ, ঘৃণা ও হতাশা ছড়াচ্ছে। আর সেটি হচ্ছে ইসলামী চরমপন্থা। একথা শুনে মনে হলো বুশ মহোদয় হয়ত জানেনই না বা অনেক কিছু জেনেও না জানার ভান করে মাঝে মধ্যে এভাবে উদ্ভট কথাবার্তা বলে থাকেন।

www.pathagar.com

বুশ সাহেব ভালো করেই জানেন, ইসলাম সন্ত্রাস, বোমাবাজি, আত্মঘাতী হামলা, হত্যাকাণ্ড, মারামারি, হানাহানি পছন্দ করে না। ইসলামী জীবন বিধানে এসবের কোনো স্থানও নেই। ইসলামের অনুশাসন হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। একথা ঠিক বিশ্বমানবতা আজ সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডবলীলায় ভীতসন্ত্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত। সন্ত্রাসবাদী বিশ্ব মুসলিম ও মানবতাবাদের চিরশত্রুতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোনও গোত্রীয়, জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয় নেই। কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য পুরো জাতি বা কোনো ধর্মকে সন্ত্রাসী চরিত্রে আখ্যায়িত করা কোনো বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। ইসলামের শান্তির বাণী, মুসলমানদের সুন্দর আচরণ ও কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম গ্রহণ করছেন, সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী একজন প্রকৃত মুসলমান কখনো কোনো প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। সমাজের প্রতিটি ধর্মানুরাগী মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করাই ইসলাম ও মুসলমানদের মূল শিক্ষা। মানবতা বিবর্জিত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি ও আত্মঘাতী হামলা ইসলামে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ বলে বিবেচিত। হাদিসে উল্লেখ আছে, দুনিয়া ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়েও আল্লাহর কাছে ঘৃণিত কাজ হলো মানুষ হত্যা করা (তিরমিজি)। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মধ্যমপন্থা, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও অবস্থা মুসলমানদের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই চরমপন্থা, ফেতনা, ফ্যাসাদ, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা কোনোভাবেই ইসলামে কাম্য নয়।

এ জাতীয় কর্মকাণ্ডকে ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বলেই বিবেচিত। এসব কর্মকাণ্ড ইসলাম কর্তৃক সমর্থন লাভের প্রশ্নই আসে না। ইসলাম হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম বা কুসুমাস্তীর্ণ পথ। এ পথের পথিক হবে শান্তিকামী, সুস্থ, সুন্দর ও সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, মমতা ও শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার সুমহান শিক্ষা তো ইসলামেরই। সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অনিরাপত্তা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মতো ঘৃণ্যতম কাজকে ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘোষিত হয়েছে নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩২)

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে শান্তির ধর্ম ইসলাম কঠোর দিক-নির্দেশনা দিয়েছে এবং সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে। পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া না হলে নৈরাজ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। ইসলামের আলোকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত আইনে সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত বিচার করা হয়, তাহলে আর কেউ সন্ত্রাস করতে সাহস পাবে না। পবিত্র কোরানে হত্যাকাণ্ডকে মহা অপরাধ সাব্যস্ত করে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে হত্যা করার শাস্তির কঠোর বিধান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। কোনও মুমিনের জন্য সমীচীন নয় যে সে অন্যায়ভাবে অন্য ধর্মের কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করবে। আর কেউ স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সুরা আন নিসা; আয়াত : ৯২-৯৩)।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে সভ্য সমাজে যেভাবে ফেতনা ফ্যাসাদ ও সন্ত্রাসবাদ চলছে, সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, এতে যেমন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয় তেমনই ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে দারুণভাবে ব্যাঘাত ঘটছে। ইসলামের নামে কেউ যদি সন্ত্রাস করে, বোমাবাজি করে, মানুষকে হত্যা করতে চায় তাহলে আমরা বলব তারা ইসলাম ধর্মকে নেতিবাচক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরতে চায়। মূলত ইসলাম যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের ধর্ম তা তাদের সঠিকভাবে জানা নেই। ইসলামের নামে যেসব উগ্রবাদী বিভিন্ন দেশে নানা পর্যায়ে আত্মঘাতী হামলাসহ ইসলাম-বিরোধীরা মানবতা বিবর্জিত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, বাস্তবিকই তারা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন বটে। যদি পরিকল্পিতভাবে বোমা মারা হয়, তাহলে বোঝা যাবে সেগুলো ফেতনা। সমাজে ফেতনা প্রতিরোধে কথা ও কলমের জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে ফেতনা ফ্যাসাদ, বিপর্যয়, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, সমাজে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হত্যার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো নরম পন্থার ধর্ম। চরমপন্থী, বাড়াবাড়ি, জোর জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ ইসলাম কখনও অনুমোদন করে না। মানুষকে খুন করে পৃথিবীতে বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কল্পিত মনগড়া ব্যাখ্যার সঙ্গে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলামের অভ্যুদয় থেকে ১৪০০ বছরের

www.pathagar.com

ইতিহাসে ইসলামের মূলধারার কোনো আন্দোলন অসি শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়নি। বরং ইসলামের আদর্শিক মহানুভবতা, ক্ষমা, উদারতা ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। তাই আংশিক বা খণ্ডিত ইসলাম এবং ইসলামের বিকৃত অপব্যাখ্যা থেকে মুসলমানদের সজাগ ও সচেতন থাকা দরকার। সাময়িক উত্তেজনা বা সস্তা আবেগের বশবর্তী হয়ে চরমপন্থা গ্রহণ বাড়াবাড়ির অবকাশ ইসলামে নেই। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাদের হৃদয় ভালোবাসাহীন, মানবতাবর্জিত, মায়া-মমতাহীন, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, সভ্য মানবসমাজের শত্রু। তাদের কোনো ধর্ম নেই, মানুষ হত্যা যে কত বড় মহাপাপ, তা তারা জানে না। নিরপরাধ মানুষ হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে এরা দ্বিধাবোধ করে না। ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলামের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। সন্ত্রাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘাতমুক্ত পৃথিবীর প্রয়োজনে ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণধর্মী আদর্শ এখন সময়ের দাবি। মানুষের সামগ্রিক জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম এক অনন্য কালজয়ী আদর্শ। ইসলামে চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলামের স্বভাব সম্পর্কে জানতে হলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত অধ্যয়ন করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো একজন মানুষকে গুপ্তহত্যা করেননি। তারা কাউকে এ কাজ করতে বলেনওনি। ইসলামের সমরনীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহানবী (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, তোমরা আগে অস্ত্র উত্তোলন করো না বা অস্ত্রের ভয়ভীতি প্রদর্শন করোনা। ইসলামের যুদ্ধনীতি প্রতিরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়, এমনকি প্রতিশোধমূলকও নয়। জেহাদ মানেই যুদ্ধ নয় বা হুট করে গিয়ে কাউকে হত্যা করা নয়। জেহাদ মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টায় সব ব্যক্তিই নিজ নিজ কু-প্রবৃত্তি দমনের ক্ষেত্রে আজীবন সংগ্রাম করবেন। আর সমরাস্ত্রের ব্যবহার হবে প্রকাশ্য ময়দানে এবং ঘোষণা দিয়ে বিশেষ অর্থে অস্ত্রসমেত জেহাদ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আক্রান্ত অবস্থায় দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে হবে। ইসলামে জেহাদের অর্থে কাউকে নির্মূল করাকে বোঝায় না। জেহাদের নাম করে যারা অশান্তি সৃষ্টি করেছে, তারা হয় জ্ঞানপাপী না হয় অন্যের হয়ে এসব করছে। বহু আগে থেকেই ইসলাম তরবারির ধর্ম বলে ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কারও ঘরে বহিঃশত্রু কেউ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার বিধান ইসলামে স্বীকৃত যা আজও বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত। ইসলাম মানুষকে ভালোবাসতে বলে, হত্যা করতে নয়। সুন্দর

www.pathagar.com

প্রগতিশীল বিজ্ঞানসম্মত ও শান্তির ধর্ম ইসলাম মানবজাতিকে বিভক্ত করতে আসেনি ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছে। অধিকার হরণ করতে আসে নি, অধিকার দিতে এসেছে। সুতরাং বোমাবাজি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখানো অনুচিত। বিদায় হজের ভাষণে নবী করিম (সা.) বিনা অপরাধে একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

ইসলামে চরমপন্থাকে জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অথচ নবী করিম (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী এবং ইসলামের তিনজন বিশিষ্ট খলিফাকে কোরান তেলাওয়াতরত অবস্থায়, কাউকে বা মসজিদের মধ্যে চরমপন্থী আততায়ীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ইসলামের শত্রুদের প্রদত্ত আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানেও কিছু চরমপন্থী এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিশ্বের কোনো কোনো দেশ কূটনৈতিক সমসার সমাধান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এখনো সেখানে রক্ত ঝরছে। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যারা যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে তাদের সংখ্যাও বেশি নয়। দেশের আলেম সমাজ, ধর্মীয় নেতা মাদ্রাসার শিক্ষক মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ উদ্ভুত সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সোচ্চার ও বলিষ্ঠ অবস্থান রেখে আমাদের ধর্মপ্রাণ জনগণকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কঠোর হলেই আর এ সমস্যা থাকে না। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ধর্মপ্রাণ মানুষকে সচেতন ও সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রচারণামূরক কর্মসূচি হাতে নিয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। আসুন আমরা জাতি-ধর্ম-দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও বোমাবাজদের নির্মূল করার লক্ষ্যে আল্লাহর মনোনীত মানবতার কল্যাণের ধর্ম ইসলামের পরম শান্তির বাণীকে ব্যাপকহারে প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টায় ব্রতী হই।

সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অধিকার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার

মানুষ মাত্রই নতুনের প্রতি আগ্রহী। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার বাসনা তার চিরন্তন। এর বিরূপতা বা অন্তরায় মাত্রই অন্তরকে ক্ষুব্ধ করে। প্রতিকারের পথও খোঁজে। এটা তার ধর্ম। এ ধর্ম সোজা পথ না পেলে অনেককে বাঁকা পথে টেনে নিয়ে যায়। আমরা কেউ স্বীকার করি বা না করি ইতিহাস এটা গোপন করতে পারেনি যে, জনগণের স্বাধীনসত্তা যেখানে যত বেশি দমিত হয়েছে কর্তৃতের কাড়াকাড়ি সেখানেই তত বেশি উগ্র হয়ে পড়েছে। সুতরাং অক্ষমতা

www.pathagar.com

বা অবিচারজনিত পরিবর্তন প্রয়াসটা জনগণ ব্যক্ত করতে না পারলেও শোধনবাদী, সংশোধনবাদী, ধনতন্ত্রের দালাল কিংবা গণস্বার্থের পরিপন্থী শক্তি দমন করার যুক্তির আড়ালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থাকেই এবং এর সবটুকু মূল্য দিতে হয় বাকি জনগণকে। অধিকন্তু পরিবর্তন আপসে হলে যে মূল্য দিতে হয় এসব ক্ষেত্রে দিতে হয় তারও অনেক বেশি।

অধিকাংশ মানুষের ধ্যান-ধারণাই কিছুটা পরিবেশ নির্ভর। কাজেই এর তাত্ত্বিক যুক্তির সঙ্গে ন্যায়যুক্তির প্রভেদ ঠিক কোথায় ও কতখানি তা সহজে নজরে আসে না। যেমন পূর্বে এ অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা সমাজগ্রাহ্য এবং যুক্তিসিদ্ধও হয়েছিল কিন্তু ন্যায়ের দরবারে এর একটিকেও কি যুক্তিসিদ্ধ করা চলে? আসলে পরিবেশের প্রভাবে যুক্তিও কিছুটা প্রভাবিত হয়, তাই বহু জনের কাছেই এ ধারণা গুরুত্ব পায় না যে শুধু সমাজগ্রাহ্য হতে হলে ব্যবস্থাটিকে অবশ্যই সার্বিক কল্যাণধর্মী হতে হয়। সুতরাং খুব স্পষ্ট করেই বলা চলে, কোনো সামাজিক বিধি-বিধান বা ব্যবস্থাপনা সে যত দীর্ঘস্থায়ী হোক, তা যদি আশ্বাস বা আস্ফালনের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে, প্রতিশ্রুত বাস্তবতার স্পর্শ না পায়, তবে তার ভেতর বাস্তবিক কোনো সত্য আছে তা কিছুতেই স্বীকার করা চলে না।

পূর্বেই বলেছি, সমাজের প্রায় সকলেই পরিবেশের অধীন। আর সে পরিবেশ গড়ে ওঠে তন্ত্রের ভেদাভেদে। পাক, বাংলা বা ভারতবাসী তো বিদেশী রাজশাসন দেখেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্র দেখেছেন, আবার সে সঙ্গে এখানে সেখানে সমাজতন্ত্রও দেখেছেন। কিন্তু প্রশাসন যন্ত্রের যে মন্ত্র মূলত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে, তার পরিবর্তন কোথায় কী ঘটল, তা কি সকলে জানেন? অন্তত এদেশেই কারও কারও মন্তব্যে এ দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পায় যে, এ সমাজ ব্যবস্থায় যদি একজন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক কয়েক হাজার টাকাও বেতন পান তবু তিনি তাঁর শিক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারবেন না, সরকারি কর্মচারীদের পাঁচগুণ বেতন বাড়ালে, এমনকি সকল খাতের সমগ্র রাজস্বটা কেবল তাঁদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে থাকলেও প্রশাসনিক অলসতা কিংবা জনগণের হয়রানির বিলোপ ঘটবে না এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের কয়েকগুণ আয় বাড়লেও উৎপাদন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছুঁতে পারবে না। এ শুধু অনুমান নয়, দেশে পরীক্ষিত ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবি। তবে এসব কথার মূল্য কিছুই নেই। কারণ একের বিষয় অন্যের জানবার বা বোঝার অবকাশ এ সমাজে নেই। পরিবেশই এ প্রয়োজন অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন অস্বীকারে সাহায্য করে। প্ররোচিতও করে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে, অপরকে বঞ্চিত করে। এ

www.pathagar.com

পরিবেশ নিজের প্রয়োজনের পরিধি ও তার ন্যায্যতা ধার্যের একতরফা সুযোগ দিয়েছে, তাই কর্তব্যহীন অধিকার বা কর্মহীন ফলের দাবিও যথেষ্ট সমাজগ্রাহ্য হতে পেরেছে। দেখা যায় একটা অংশের মানুষের দাবিতে এক এক সময় চাকা অচল হয়ে গোটা দেশবাসীর জীবনযাত্রা অচল করে দেয়। সমগ্র দুগ্ধ প্রকল্প বন্ধ করে রোগী ও শিশুদের অনাহারে রেখে, কখনোবা লক্ষ লক্ষ টাকার দুধ নষ্ট হয়েও যায় এবং সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থা অচল হয়ে বহু রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটায়। খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন এক কথায় কোনো কিছুর উপরই বাকি জনগণের কিছুমাত্র অধিকার থাকে না। তাদের প্রতিবাদের এক্তিয়ারটা অগ্রাহ্য হয় আর এসব অধিকারই ন্যস্ত হয় কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ওপর, এর মূলেও থাকে এ সামাজিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন। সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে, কেবল ওদের দাবিই গণতান্ত্রিক অধিকারভুক্ত। যে কাজের ফলে একজন সাধারণ নাগরিকের জেল, জরিমানা বা হাজতবাস হয়ে থাকে সে কাজও ওদের গণতন্ত্র সম্মত অধিকারের আওতায় পড়ে। আর এ অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হলেই যে কোনো শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠন যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্রতিষ্ঠান যতদিন খুশি অচল রাখতে পারে। পারে কারণ সাধারণ মানুষ এবং যাত্রী, রোগী বা শিশুদের কোনো সংগঠন নেই। আর সেটা যে সম্ভবও নয় সেকথা ওই দাবিদার এবং সমাজকর্তারা ভালো করেই জানেন। জানেন বলেই বাকি সকলের অধিকার গৌণ হতেও কিছুমাত্র আটকায় না। কিন্তু গণতন্ত্র? জনগণ ভোট দিচ্ছে না? রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হচ্ছে না? তা ঠিক এবং এরপরও যদি সংসদীয় অর্থাৎ দলীয় গণতন্ত্রের মহিমা কেউ না বুঝে থাকেন তবে সে অপরাধ তো তারই! তাও বটে! কারণ এ প্রশ্ন তো কেউ তোলেন নি এবং এও বোধহয় ঠিক যে, এ কোটি কোটি মানুষ 'গণ' জীবনকে অচল করে দেওয়ার আইনসিদ্ধ অধিকার ওই মুষ্টিমেয়গণরা পেলেন, একি সমগ্র দেশবাসীর অভিমত নিয়ে? সম্ভবত কেউ তোলেন নি এবং এও বোধহয় ঠিক যে, সে সুযোগও সাধারণ মানুষের কোথায়ও জোটে নি। যদিও প্রায় সকলেই জানেন লুটের সম্পদ ছড়িয়ে দিলে দাতার তাতে আপাত ক্রটি বেশি থাকে না কিন্তু সে সম্পদ কেবল সবল ব্যক্তিরাই কুড়িয়ে নিতে পারেন এবং নিয়েও থাকেন তারাই। দুর্বল যারা তারা বঞ্চিত হন। পৃথিবীর সর্বকালের আর সব শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেও হয়ত এ লুটের সম্পদ ছড়াবার একটা স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। চালাক ব্যক্তিরা দু'হাতে লুটে নেওয়ার যতটা সুযোগ পেয়েছেন, সরল, সৎ এবং দুর্বল যারা তারা ঠিক ততটাই অসহায় ও বঞ্চিত হয়েছেন, হচ্ছেন। নিত্য নতুন লুটেরার আবির্ভাবও সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টায়েনবি অনগ্রসর সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যেখানে অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তিগুলো অধিকতর উৎপাদন ও তার প্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে অক্ষম সেখানেই সমাজ অনগ্রসর। কর্তব্যের চেয়ে অধিকার সচেতনতা এ সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ। মানবেন্দ্রনাথ অনেকটা এ কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতির মধ্যে আমি কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য বিবেচনা করি না। অর্থনীতি যখন কোনো ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক অধঃগতি সাধন করে তখন তা হয় দুর্নীতি।

অধিকাংশ সমাজে বিশেষ করে অনুন্নত সমাজে কর্তা ব্যক্তিদের অধিকার চেতনা আজ এমন একটি স্থানে উপস্থিত হয়েছে যার ফলে শুধু তাদের নয়, সমাজের বিরাট এক অংশের কর্তব্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। নগদ অর্থ ফাঁকি আর মূল্য নিয়ে কর্মে ফাঁকি যে একই পর্যায়ে পড়ে, উপরন্তু এ ফাঁকি আরো বৃহৎ ক্ষতির ক্ষেত্র তৈরি করতেও পারে, এ বোধটাই বহুর চেতনা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। শুধু মাইনে বৃদ্ধি চাকরির স্থায়িত্ব বা পদমর্যাদার উন্নতি থেকে এ বোধশক্তি আবার ফিরে আসবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তা বোধহয় সম্ভব নয়। আবার এ সম্ভাবনা যদি যুক্তির বিচারে নস্যাৎ হয় তবে সমাজের বাকি মানুষই-বা ন্যায়নিষ্ঠ থাকবে কোন আদর্শের প্রভাবে। আদর্শও প্রকৃত প্রচারে প্রকাশ পায় না, পায় প্রয়োগে। সেখানে ন্যায় নিষ্ঠার অভাব থাকলে কারো পক্ষেই সত্য নিরূপণ করা বা ঠিক লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠার অভাব থাকলে সেখানে অনিবার্য কারণেই অসত্য সত্য হবে এবং সত্য অসত্য হবে। সমাজের সকল মানুষের সক্রিয় প্রতিকার প্রচেষ্টা ভিন্ন এর প্রতিবিধানও সম্ভব নয়। আবার কিছু কর্তৃত্ব না থাকলে কারো সক্রিয়তাই কিন্তু আন্তরিক হয় না। সুতরাং সমাজকে যদি ন্যায়নিষ্ঠ রাখতে হয় এবং সে সমাজকে যদি মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করতে হয় তবে তার একমাত্র ন্যায়গ্রাহ্য পথই হলো কর্মশক্তি নিয়োগ এবং সে কর্মশক্তি নিয়োগে অন্তরের সায় পায় না, তেমনি একটি সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্বের বাইরে যিনি এ কর্তৃত্বের অধিকারী হন তার চেতনা কিছুতেই সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ থাকতে পারে না। 'পারে' এ বক্তব্য হয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত, নয়তো অবিবেচনা প্রসূত। কিন্তু সত্য কিছুতেই নয়। নেতৃত্ব ও সমতাভাবের বাইরে গেলেই সেটা হয় কর্তৃত্ব।

বিষয়টি অন্যভাবে পর্যালোচনা করলে হয়ত আরও একটু স্বচ্ছ হবে। যেমন সরকারই হন কিংবা কোনো ব্যক্তি মালিকই হন, শ্রমিক-কর্মচারী বা জনগণের সব দাবি মেটাবার শক্তি কারও থাকে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবাস্তবও। রাজতন্ত্রে

www.pathagar.com

কিংবা কোনও ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ স্বভাবতই হয় সীমিত এবং তাদের আত্মচেতনাও যথেষ্ট বিকাশ লাভের সুযোগ পায় না। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে কিছু মানুষ সহজেই সর্বেসর্বার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। যদিও অনেকে বলেন, 'এ সর্বেসর্বারা কিন্তু কোনো অধিকার বলেই সমগ্র সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল করতে সাহস পান নি, যেটা এ গণতন্ত্রে মাত্র কয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব হচ্ছে।' এটা অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয় কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষের আত্মচেতনা সজাগ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, কাজেই বিভিন্ন মানুষের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন দাবি জেগেছে, সমাজের গতির সঙ্গে সে দাবির জোগান বাড়ছে এবং যেহেতু গণচেতনা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নিকট মূল্যবান হাতিয়ার, কাজেই দাবি জোগাবার লোকও আছে। সুতরাং কূটতর্ক শেষেও এ সিদ্ধান্তে আসা কিছুমাত্র কষ্টকর নয় যে দাবির সঙ্গে দাবি মিটিয়ে নেওয়ার সুস্থ পরিবেশ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো পথই আর তাদের সামনে খোলা থাকে না।

অনেকে মনে করেন, 'যেখানে বেশির ভাগ মানুষ অশিক্ষায় ও দারিদ্র্যে সমাজের সঠিক অবস্থা বুঝে নিতে অক্ষম সেখানে একের স্থলে দেশে সমষ্টিগত দলের শাসন হলে যে কোনো সমস্যার মোকাবিলা সহজ হবে। কারণ এতে সমগ্র দেশবাসী একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচির শামিল হতে অন্য কারো প্ররোচনা বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। দলীয় সংঘাত অথবা ক্ষমতার কাড়াকাড়ি না থাকলে জনগণের পক্ষে সঠিক পথ বেছে নেওয়া সহজ হবে। মনে হয় এ ধারণা এসেছে মূলত বহু দলের সংঘাত থেকে, যদিও মাত্র ২-৩টি দল যেখানে, সেখানেও এ সংঘাত আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েছে, কাজেই এ ধারণার ঔচিত্য না হোক, ঔদার্য ও সরলতার মূল্য কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু যুক্তি?

প্রথম এরূপ মিলন কোথাও পোক্ত হয়েছে তেমন নজির নেই। মিলন যদিও-বা হয় কিন্তু যে কারণে কোনো একটি রাজনৈতিক দলই দলীয় স্বার্থের উপরে থাকতে পারে না, সে কারণটি একত্র হলেই দূরে থাকবে হ্রাস পারে এ হয়ত যুক্তি হতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষের স্বার্থটাই যদি সকলের একমাত্র লক্ষ হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন দলের উৎপত্তি কেন? মত ও পথ কেন ভিন্ন? অন্যের যোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা একত্রে একই পথ ধরে এগুবেন কী করে? ঔদার্য যতই থাক এর ন্যায়গ্রাহ্য উত্তর কিন্তু শক্ত। বরং পৃথক অস্তিত্বের মিলনে আত্তঅস্তিত্বের প্রয়োজনই যে মিলনপূর্ব ঔদার্যটুকু আর সহজে পিষে ফেলতে পারবে তার পক্ষে যুক্তি আছে। এসব ক্ষেত্রে আদর্শ অর্থে যে উঁচু দরের একটি আবেগ আমরা কল্পনা করি তার বাস্তব মূল্য কিছু যদি থাকেও তবে তা

www.pathagar.com

আছে কেবল সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের কাছে। যারা নেতা অর্থাৎ রাজনীতি যাদের পেশা এবং কর্তৃত্ব যাদের সাধনা, তাদের কাছে এর মূল্য প্রায় সবটাই বাচনিক। প্রয়োজনে এর রূপ পাল্টায়, নতুন ব্যাখ্যা হয়। কাজেই এক দলের স্থলে বহু দল এলে তার মৌল পরিবর্তন হবে, সামাজিক পরিস্থিতি পাল্টাবে এর যুক্তিগ্রাহ্য হেতু নেই।

লক্ষ করলেই দেখা যাবে, রাজনৈতিক দল মাত্রই নেতা ও কর্মীর মূল্য ধার্য হয় তাঁর সমর্থক সংখ্যার বিচারে। যার যত বেশি সমর্থক প্রকৃতপক্ষে তিনি তত বড় নেতা বা কর্মী। এ সমর্থন কিসের প্রভাবে হবে তার কোনও সামাজিক নির্দেশ নেই। প্রতিভা, অর্থ এমনকি প্রকাশযোগ্য নয় এমন কিছুর প্রভাবেও এটা হতে পারে। অর্থাৎ সমর্থনের হেতু ব্যক্তিত্ব, না অন্য কিছু সেটা অপরিহার্য নয়, তাঁর গুরুত্বের প্রধান অংশ কেবল সমর্থক সংখ্যা। কিন্তু এ থেকে এমন একটা প্রশ্নও কারো মনে জাগতে পারে, 'যে ব্যবস্থায় সমাজের উচ্চপদে এমনকি মন্ত্রিত্বে বৃত হতে কোনো নির্দিষ্ট মানের যোগ্যতার দাবি করতে চায় তবে তা প্রতিরোধের কোনো সুযোগ থাকে কি? একদিন তো তবে গোটা সমাজকেই এ দাবি গ্রাস করতে পারে।

হয়ত বলা হবে, এ ধরনের একটি চরিত্র শুধু অনগ্রসর দেশেই দেখা দিতে পারে। কারণ জনগণ যথেষ্ট সতর্ক নয় তাই অযোগ্য ব্যক্তিরাও এখানে জনপ্রতিনিধি হতে সাহস পান এবং এদের কারো কারো পক্ষে নগদ বা মন্ত্রিত্ব মূল্যে বিক্রি হওয়াও সম্ভব, যার অপরিহার্য প্রভাবে গোটা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধই অবনমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু উন্নত কোনো সমাজে এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

এ একটি তর্কের বিষয়। কোনো সমাজে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব কিনা সন্ধানের অপেক্ষা রাখে। তবে এও ঠিক, উন্নত দেশের রাষ্ট্রকর্তারা অভিজ্ঞ এবং তার চেয়েও সতর্ক। একটু বেশি চালাকও বোধহয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে আড়াল রাখার কূটকৌশলে ওরা বেশি রপ্ত। তবে এসব সত্ত্বেও কিন্তু এমন অকাট্য প্রমাণ মেলে নি যা থেকে মূল প্রশ্নকে নস্যাৎ করা চলে। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধটা তো আর আড়ালে রাখা যায় না।

অনেকের মতে সমস্যা এবং অভাব আছে বলেই মানুষ নিত্যনতুন হদিস পাচ্ছে, আরো বেশি পাওয়ার তাগিদ বাড়ছে। ফলে মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও মনীষারই বিকাশ ঘটছে। অভাব এবং সমস্যা না থাকলে মানুষের চলার গতিই শ্লথ হয়ে যেত।

www.pathagar.com

অনেকের মতে সমস্যা এবং অভাব আছে বলেই মানুষ নিত্য নতুন পথের হদিস পাচ্ছে, আরও বেশি পাওয়ার তাগিদ বাড়ছে, ফলে মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও মনীষারই বিকাশ ঘটছে। অভাব এবং সমস্যা না থাকলে মানুষের চলার গতিই শ্লথ হয়ে যেত।' হয়ত তর্কের দরবারে এ মতের গুরুত্ব কিছুটা আছে, কিন্তু যুক্তির সামনে এ মত সম্পূর্ণ দ্যুতিহীন। কারণ অভাব বা সমস্যাহীন পরিবেশ আর প্রাচুর্য থেকেই মানুষের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যেত এটা যেমন প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য নেই, তেমনি সমস্যাহীন পরিবেশ আর প্রাচুর্য থেকে মানুষের চলার গতি শ্লথ হয়ে যাবে এরও ন্যায়গ্রাহ্য যুক্তি নেই। আদতে এর সবটাই এক অবাস্তব কল্পনা। প্রাচুর্য সীমাহীন যদি হয়ও তবুও আরও পাওয়ার বাসনাকে কখনও নিঃশেষ করতে পারে না। অর্থাৎ প্রাচুর্য কামনার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে এ একেবারেই অসম্ভব। কামনা থাকলে সমস্যা কিছু থাকবেও কাজেই কামনাবিমুখ প্রাচুর্য এবং সমস্যাহীন সমাজ আসলেই অলীক কল্পনা।

কিন্তু প্রশ্ন এ নয়। এসব যুক্তিতর্ক বর্তমান সমাজের একটি রক্ষাকবচ মাত্র। সাধারণ মানুষের চেতনাকে এরই ভেতর আবদ্ধ রাখার ফিকির। আসলে সমস্যা কিছু ছিল, আছে এবং থাকবেও। এর অনেকটাই হয়ত প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু সে সমস্যা সৃষ্টি করা হয় এবং যে কল্পিত সমস্যার গল্প ফেঁদে অধিকাংশ মানুষকে অসহায় ও পরনির্ভর করার চেষ্টা চলে এ প্রসঙ্গের মূল বিষয় সেটিই। অর্থাৎ যে সমস্যার চাপে আজ বেশির ভাগ মানুষই বিকাশ বঞ্চিত, নিষ্প্রভ ও নিষ্পেষিত এবং অতি ক্ষুদ্র একদল মানুষ এ সমস্যাকেই পুঁজি করে পুষ্ট হচ্ছে, বাকি সব মানুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কর্তৃত্ব আর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেয়ে তিলে তিলে এদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে, সে সমস্যার বিলুপ্তি ঘটানোই হচ্ছে মানব সমাজের মূল সমস্যা। সহজ কথায়, সমস্যা মানুষের বিকাশ শক্তিকে বিকশিত করতে ইন্ধন জোগালেও তার নিজ চরিত্রের পরিবর্তন ভিন্ন সকল মানুষ কিছুতেই বিকশিত হবে না। সমস্যার চরিত্র পরিবর্তন করতে হলে সর্বাগ্রে চাই সমাজ ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যে এখানে বাকি মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, তাদের সৃষ্টিধর্মী চেতনার উপর অসত্যের আবর্জনা চাপিয়েছে, এ সরল সত্য দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কারও বিন্দুমাত্র ন্যায়বোধ অবশিষ্ট থাকলে স্বীকার করতে হবে এ কথাও যে, মানব সমাজের বৃহত্তর অংশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে গণ্ডিবদ্ধ রাখার নির্লজ্জ বাসনা আর সে সুযোগ থেকেই জন্ম নিয়েছে পরিচিত সমাজের সমুদয় সমস্যা। উদ্ভব হয়েছে অ্যাটম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি

www.pathagar.com

বিধ্বংসী মারণাস্ত্র। সৃষ্টি ও হাতিয়ার হয়েছে মানুষকে বেকার বা কর্মবিমুখ করার যন্ত্র। স্থায়ী হয়েছে ব্যাপক বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য। মানুষ যদি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের এ সমস্যার অবসান ঘটাতে পারে অর্থাৎ যারা এসবের সৃষ্টিকর্তা তাদের কর্তৃত্বচ্যুত করে সেখানে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে আগামী দিনের সমস্যার উদ্ভব হবে সাগর সেচে মানিক তোলার যন্ত্র। মানুষকে পরাধীন ও পদানত করার অস্ত্রের বদলে তৈরি হবে আত্মবিকাশের অস্ত্র। প্রতিভার বিকাশের সুযোগ সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরের সকলের ভেতর ব্যাপ্ত হতে পারলে অর্থাৎ ধূর্ত ব্যক্তিরা ব্যাপ্তির পথ রুদ্ধ করতে না পারলে সমাজের এ পরিবর্তন দূরাগত তো নয়ই সম্ভবত বহু পূর্বেই মানবজাতি ওই পর্যায়ে পৌঁছে যেত।

কারণ প্রতিভার যত আবির্ভাব হয়েছে এবং যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার ভেতর বেশিটাই হয়েছে কঠিন প্রতিযোগিতার ও তীব্র প্রতিবন্ধকতার বাধা সরিয়ে। অশুভ বাধা সরাতে গিয়ে বহু প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে এবং তিন চতুর্থাংশ মানুষ আদৌ কোনও সুযোগই পায় নি। সুতরাং এ সত্য উপলব্ধি করতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, সমাজে দল ও গোষ্ঠীর সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব না থাকলে আজ অবধি যত প্রতিভা ও যত মনীষীর সাক্ষাৎ মানুষ পেয়েছে তার চারগুণ বেশি অবশ্যই তারা পেত। তবে এও সঠিক সংখ্যা নয়। কারণ মানবশক্তি যতটা অপরকে পদানত রাখতে ব্যয় হয়েছে তা যদি না হতো এবং কোনো প্রতিবন্ধক তার সম্মুখীন না হয়ে প্রত্যেকেই যদি সমসুযোগ পেত তবে কেবল প্রতিভার প্রতিযোগিতায় আরও বহুগুণ এবং আরও উন্নত প্রতিভার জন্ম হতো। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অধিকার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার।

সৎকাজ : জনগণের আস্তা অর্জনের সহজ পন্থা

মনুষ্য জীবন লাভ করা চরম সৌভাগ্যের কথা। সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার গৌরব শুধু মানুষের প্রাপ্য। তাই মনুষ্য জীবনকে অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে যাপন করতে হয়। মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে, মহাগ্রন্থ আল কোরান ও হাদিসে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মহানবী তাঁর স্বচ্ছ জীবনযাপনের মাধ্যমে যে জীবনাদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তা অনুসরণ করলে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। মানুষকে সুন্দর-অবয়ব দান করেছেন পরম দয়াময় সৃষ্টিকর্তা। অন্যদিকে তার মধ্যে এমন অপগুণও দিয়েছেন যা দ্বারা সে

www.pathagar.com

শয়তানকেও হার মানায়। মানুষের মধ্যে যে ভালো গুণগুলো আছে তার অনুশীলনে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আবার তারমধ্যে যে পশুত্ব আছে, তাকে দমন কিংবা মার্জিত না করলে তার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে। বিবেক মানুষের অন্তরে আল্লাহর ক্ষুদ্র একটি কণ্ঠস্বর। মানুষকে ভালো কাজে বিবেক উৎসাহ যোগায় এবং খারাপ কাজে বাধা দেয়। বিবেকবান মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে না। এটা তাকে সৎকর্ম করতে প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান অর্জন করে তার আলোকে পথ চলতে চলতে মানুষের অন্তরে মনুষ্যত্ববোধ প্রস্ফুটিত হয়। মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, খুন-খারাবি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। জ্ঞানের আলো ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সৌন্দর্যবোধ পবিত্রতা, রুচিবোধ, প্রেম, ভালোবাসা, ত্যাগ, সেবা প্রভৃতি সৎগুণাবলির সমাবেশ ঘটে মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের অন্তরে। বিবেকবান, চরিত্রবান কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কারো কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে এসব লোকের দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হয়।

শিক্ষিত, জ্ঞানী, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, বিচক্ষণ, দায়িত্ববোধ ও দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা আছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোতে এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ বাঞ্ছিত গুণগুলো অর্জন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে। দেশের উন্নতি, সমাজের শৃঙ্খলা, সংহতি ও দেশের নিরাপত্তা এ সকল যুবকদের হাতে নিশ্চিন্ত বলে দেশবাসী মনে করে। কিন্তু বিগত দু'দশকের পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এবং বর্তমান হালহকিকত প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে যা দেখেছি, তাতে আমরা নিরাশ হয়েছি এবং আতঙ্কে আঁতকে উঠছি। সন্দেহ জাগে, আমাদের জীবনযাত্রায় কোথাও যেন একটা গলদ আছে। গলদগুলোকে খুঁজে বের করার সময় এসেছে। এতে বিলম্ব হলে জনগণ ভবিষ্যতে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে।

প্রচার মাধ্যমের আধুনিক ভাষায় পৃথিবী আজ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, আধুনিক ভাষায় যাকে গ্লোবাল ভিলেজ বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় মুহূর্তেই। তাই আতঙ্কবাদ শুধু কোনো দেশের এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। সারা পৃথিবীতে আতঙ্কবাদের এক বিভীষিকা মানুষের মনে একটা ভয়ের জন্ম দিচ্ছে এবং তা আমাদের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর কোনো জনপদ এ অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়। প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

চলছে হত্যা, ধ্বংস, মৃত্যু, লুটতরাজ ও বিস্ফোরণ, তখন বিশ্বে বিবেকবান মানুষ অক্ষমের মতো তা অবলোকন করছে। ইজরায়েলি সেনারা যখন মাত্র ক'বছর আগে নির্বিচারে লেবাননে নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করছিল তখন বেদনাদায়ক হলেও নির্বিকার ভূমিকা পালন করেছিল জাতিসংঘ। জনপদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল শুধু মুখেই বললেন যে ইজরায়েল বাড়াবাড়ি করছে ফলে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া যুগ যুগ ধরে যখন ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্তাইনে অবাধে চলছে ধ্বংসলীলা পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘ তখন নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কি নেই এ মহান সংস্থার? অথচ মানুষের কল্যাণের জন্যই গঠিত হয় এ সংস্থা।

মানব সভ্যতার গতি উন্নতির উচ্চ শিখরে। চাঁদে মানুষের বিজয় পতাকা গ্রথিত হয়েছে। শক্তিশালী পরমাণু অস্ত্রের ভাণ্ডারে ধনী দেশগুলোর ভাঁড়ার পরিপূর্ণ। অস্ত্রের বেচা-কেনার সরস বাজার। প্রতিযোগিতা চলছে মারণাস্ত্র তৈরির। মানুষের বুদ্ধির জয় জয়কার। উত্তর কোরিয়ার ছোট্ট দেশও পরমাণু শক্তিধর হয়েছে। আমেরিকার মতো দাদাকেও পাত্তা দিতে চায় না। বাকি উন্নত দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে। পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করলে ভারতও তাই করে, ভারত করলে পাকিস্তানও করে। পৃথিবীর রূপ যেন বদলে যাচ্ছে। একটি মৃত্যুর উপত্যকায় আমাদের বাস। অনিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছি।

এ অসহনীয় অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার চেয়ে ঢের ভালো ছিল হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসাবশেষের আগের দিনগুলো। মাঝেমধ্যে যুদ্ধ, মড়ক, মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভয়াবহতা ছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ছিল না। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা প্রতিদিন মৃত্যুভয়ে ম্রিয়মান। চৌদ্দ কোটির এ ছোট্ট দেশে এক ডজন উগ্রপন্থী সংস্থা আমাদের জীবনকে করেছে ভারাক্রান্ত। ভিন্ন হলেও একটি সমস্যা কিন্তু কমন এবং তা হলো উচ্ছৃঙ্খল যুবশক্তি এবং নৈতিক চরিত্রে দুর্বল বর্তমান প্রজন্ম। উদ্দেশ্যহীন হত্যা, গন্তব্যহীন যাত্রা, বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও খেয়াল খুশিমতো জীবনযাপন ইত্যাদি ব্যাধি পৃথিবীর সব দেশেই বর্তমান। সব দেশের চিন্তানায়করা এ ব্যাধি ছাড়াবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণা করে যাচ্ছে নিজ নিজ দেশের বর্তমান অবস্থানকে সম্মুখে রেখে। আমাদের বাংলাদেশের চিন্তাবিদরা কি ভাবছেন, এ থেকে উত্তরণের উপায়ই-বা কি?

www.pathagar.com

আলোচনার মাধ্যমে উগ্রপন্থীদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আমাদের দেশেও হয়েছে। সরকারের শর্ত, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী কোনও দাবি সরকার মানবে না, পরিষ্কার কথা। সরকারের হাতে যে পথ খোলা আছে তা হলো দেশের ঐক্য, সংহতি উন্নয়নকে অব্যাহত রেখে উগ্রপন্থীদের কঠোর হস্তে দমন করা। কিন্তু দেশের সর্বত্র যে ভ্রষ্টাচার থাবা মেলেছিল তা বিভিন্ন নামে বাংলাদেশের শাসনযন্ত্রকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে দীর্ঘদিন। এ ব্যাধির সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি দেশের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা। এ ব্যাধির সমাধান সূত্র পেতে হলে নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কঠিন সাধনা করতে হবে। সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও সৎ পথে গমনের মাধ্যমে আমাদের মনের কালিমা ঘুচে যায়। পাক কোরানের বাণী থেকে বোঝা যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা সৎ গুণাবলিকে প্রস্ফুটিত করে। বিবেকবান, ত্যাগী-নাগরিকবৃন্দের হাতে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়।

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় চরিত্রহীন, লোভী, স্বার্থসর্বস্ব লোকেরাই দেশের শাসনভার কোনো কোনো সময় গ্রহণ করে থাকে। এমনও সময় ছিল যখন প্রজাহিতের সব পরিকল্পনার রূপায়ণে বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ চলে যেত মন্ত্রী, আমলাদের পকেটে। প্রজাদের কল্যাণ পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। গরিব প্রজাদের জীবন দুঃখের শর্বরী আর পোহাতে চায়নি। বঞ্চিত, শোষিত, জনসাধারণের মনে বিদ্রোহভাব জেগে উঠেছিল। এতে উগ্রপন্থীদেরও সৃষ্টি হয়। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এ বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো তোড়ফোঁড়ের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষোভ মেটাতো। এতে দেশ হয় অস্থিরতার শিকার। কাদের জন্য সমাজের এ বড় বড় সমস্যাগুলো মাথা তুলেছিল?

সমাজের এ অবক্ষয় বন্ধ করতে হলে সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, দেশের অগ্রজ নাগরিকগণের নিজ নিজ গৃহে চরিত্র গঠনের আন্তরিক কৌশল চালাতে হবে। যে নিজের পরিবারের উন্নতির জন্য উন্নত মনোভাব নিয়ে সকল কাজ সম্পাদন করার শিক্ষা পেয়েছে, দেশ-জাতির জন্য সৎভাবে সে কাজ করবেই। দেশের জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসকে সম্মান দিতে হবে। তাদের কল্যাণের কাজে ধন-সম্পদ, মেধা ও সাহসকে কাজে লাগাতে হবে। জনসাধারণের কল্যাণে পরিকল্পনাকে শত শতাংশ কাজে লাগিয়ে সরকারের আন্তরিকতার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

দীর্ঘ ৫০-৬০ বছর ধরে শাসক ও আমলাদের মধ্যে যে মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে তাতে জনগণের কাজ করার চেয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যই

www.pathagar.com

প্রবল প্রতীয়মান হয়েছে। ভ্রষ্টাচারী কর্মচারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে, আন্তরিকতার সাথে সরকারি নীতিকে কাজে রূপায়ণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি হওয়া উচিত। এটা তাদের কর্মে প্রেরণা যোগাবে।

দীর্ঘদিনের বঞ্চিত সমাজের সর্বস্তরের জনগণের উন্নতির পরিকল্পনাগুলো সরকারের কড়া নজরদারিতে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর রূপায়িত হলেই জনগণের আস্থা ফিরে আসবে সরকারের ওপর। আমাদের সৎ গুণাবলি পুনরায় অর্জন করতে হবে। ভ্রষ্টাচারে ডুবে যাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে নব চেতনার সৃষ্টি করতে হবে। বোঝাতে হবে জনসেবাই তাদের মূল লক্ষ্য। একবার শাসককুলের মনে সততার উদয় হলে দেশে আর বিশৃঙ্খলা অশান্ত পরিবেশ ও হাহাকার থাকবে না। মানুষ সুন্দর, সৎভাবে চলার পথ খুঁজে পাবে।

স্কুলে কচিকাঁচাদের আচরণ ও তাদের প্রতি যথার্থ ব্যবহার

যদিও সরকার বা শিক্ষা বিভাগ শিশুদের স্কুলে ভর্তির জন্য ছ'বছর নির্ধারণ করেছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ৩ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের ভর্তি করা হচ্ছে। এভাবে শিশুদের শৈশব কেড়ে নিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাবার পর শিশুমনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তা অভিভাবকরা খুব একটা বোধ করেন বলে মনে হয় না। কোনো রকমের প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ করে কোনো একদিন মা-র কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্লাসে শিশুটিকে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে।

যাহোক বর্তমানে এ জাতীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্কুলে ভর্তি করার রেওয়াজ যখন চালু হয়ে গেছে শিক্ষা বিভাগের নির্দিষ্ট ভর্তি বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, তখন অভিভাবকদের জেনে রাখা ভালো প্রাক স্কুল ভর্তি সময়ে বাড়িতে তাদের কিছুটা প্রস্তুতি প্রয়োজন। যে সমস্ত অভিভাবক কোনো প্রস্তুতি ছাড়া শিশুদের স্কুলে ভর্তি করে থাকেন দেখা যায় তারা ভর্তির সপ্তাহখানেক অথবা তারও কিছুটা বেশি সময়ব্যাপী শিশুরা সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আগে বলা হয়েছে শিশুদের প্রাক বিদ্যালয় প্রস্তুতির অভাব। এতদিন শিশুটি বাড়িতে সবসময় মা-বাবার কোলে ও পরিবারের সবার আদরে অভ্যস্ত জীবন কাটিয়েছে। হঠাৎ করে সে পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ অপরিচিত মহলে তার শিশুমন হাহাকার করে ওঠে। এ বিচ্ছিন্নতাবোধ শিশুটিকে একান্ত

www.pathagar.com

অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়। তখন তার হৃদয় বাঁশপাতার মতো কাঁপতে থাকে। প্রথম কিছুদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার কোনো সান্ত্বনা বাক্য শিশুটির মনকে শান্ত ও আশ্বস্ত করতে পারে না। অনেক সময় শিশুটি স্কুলে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য স্কুলে যাবার এ অনিহার অন্য কারণও থাকতে পারে। যেমন শিশুদের রূঢ় আবেগ অথবা ক্লাসে কোনো উগ্র শিশুর উপস্থিতি ইত্যাদি।

অথচ প্রাক-বিদ্যালয় প্রস্তুতি বহুলাংশে বাঁচাতে পারত এ আবেগাহত শিশুটিকে। এখানে মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্কুলে ভর্তির আগে অভিভাবকদের দেখে নিতে হবে, তাদের প্রতিবেশীদের কোনো কোনো সমবয়সী শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে এবং সে সমস্ত শিশুদের সঙ্গে নিজের শিশুটিকে পরিচিত করে তুলতে হবে। অভিভাবকদের তাদের একত্রে খেলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আবার অন্যের শিশু নিজের মতো নয় এ জাতীয় ভাবনা না থাকাই ভালো। এভাবে পরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে নতুন অবস্থায় ক্লাসে এ শিশুগুলো নিজেদের আর সম্পূর্ণ অসহায় ভাববে না। কাঁদার প্রবণতা অতি স্বল্প সময়ে তিরোহিত হবে ও অপরিচিত পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

তদুপরি শিক্ষকরা যদি শিশুদেরকে তাদের আন্তরিক ও মধুর ব্যবহারে আপন করে নেন তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। দেখা গেছে, অনেক অভিভাবক আছেন, যারা দুরন্ত শিশুদের স্কুলের ভয় দেখিয়ে শান্ত করতে চান। ফলে শিশুদের মনে স্কুল সম্বন্ধে একটি ভীতির সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় ভীতি সঞ্চার সম্পূর্ণ অনুচিত। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ে শিক্ষককে ঘিরে এক অজানা আশঙ্কা শিশুটির মনকে সন্ত্রস্ত করে তোলে।

আরো কিছু শিক্ষণীয় বিষয় প্রাক-ভর্তি তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে ভাষা শিক্ষা। সে বিষয়ে মা-বাবার দায়িত্ব সমান। তিন-চার বছর বয়সের শিশুদের খেলাধুলা হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম। পিতামাতা যত বেশি সম্ভব খেলাচ্ছলে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা শিশুদের সঙ্গে বলবেন ততই ভালো। বাড়ির বাগানে গিয়ে ন্যাচার স্টাডি বা প্রকৃতি জ্ঞান, অর্থাৎ রকমারি ফুল-ফলের নাম শিশুদের শেখাবেন। মা-বাবা শিশুকে সামাজিক উৎসবগুলোতে অবশ্য নিয়ে যাবেন। তাতে তারা ঘরের বাইরে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিকতার ভাবনার জন্ম নেবে। ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয়ে সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করে থাকে।

www.pathagar.com

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই মা-বাবা এর সুযোগ নিয়ে শিশুটির সামনে কিছুটা সময় প্রতিদিন বই খোলা রেখে সশব্দে পড়াশোনা করবেন। দেখবেন শিশুটি তখন এগিয়ে আসবে। ছবির বই সামনে রেখে এটা কি, সেটা কি অনুরূপ প্রশ্ন করে উত্তর বলে দেবেন এবং অবশ্যই তার কাছ থেকে উত্তর চাইবেন। দেখবেন আপনার শিশু মুখ খুলেছে। উচ্ছ্বাসিত হয়ে জবাব দিচ্ছে। আপনি তখন প্রশংসা করে তাকে আরো উৎসাহিত করবেন। শিশুটি যখন রাগ, হতাশা অথবা ক্ষুধা বা আনন্দ প্রকাশ করে, মা-বাবা তোমার রাগ হয়েছে, তোমার ক্ষুধা পেয়েছে এ জাতীয় সংবেদনশীল কথাবার্তা বলে তাদের ইমোশনাল ডেভেলপমেন্টের সাহায্য করতে পারেন। লক্ষ্য করা গেছে দু'বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশু ২০০ থেকে ২০০০ শব্দ এভাবে শিখে নিতে পারে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ অভিভাবক আজকাল শিশুদের যথাযথ প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে নিজেদের শিশুদের অভ্যাস, মনোভাব, ধারণা, বাসনা, প্রত্যাশা ও চালচলন লক্ষ করে নিজেরা প্রতিপালিত হচ্ছেন। প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে শিশুটি সমষ্টি জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে ও ধীরে ধীরে স্কুলের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়বে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তখন সদ্য-আগত শিশুদের আশা, প্রত্যাশা, অনুরাগ ও আসক্তি সংবেদনশীল মন নিয়ে বুঝে নিতে হবে। শিশুদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার বা রক্তচক্ষু না দেখিয়ে তাদের সাথে সহাস্য ব্যবহার করতে হবে। তাহলে তারা বিদ্যালয়ে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

অধিকাংশ অভিভাবকের ধারণা তাদের শিশুরা মিথ্যা বলে না। প্রকৃতপক্ষে তারা শিশুদের সারল্যকে সত্যকথন বলে ভুল করেন। তাদের মিথ্যা বলার প্রবণতা লক্ষ করা যায় বিদ্যালয়ে যখন শিশুরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। হয়তো শিশুটি নিজে ঝগড়ার সূত্রপাত করেছে কিন্তু যখন সে বুঝবে দোষ তার উপর চলে আসবে তখন সে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অনর্গল মিথ্যা বলতে থাকে। সে জানে তার আচরণ শিক্ষক অনুমোদিত, তাই সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বাড়িতে অনেক অভিভাবকের কঠোর শাসন থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে বা আত্মঅবমাননা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। লক্ষ করা গেছে, অভিভাবক রূঢ় ব্যবহার পরিহার করে সংবেদনশীল মন নিয়ে শিশুদের সমস্যা ও প্রত্যাশা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ও ধৈর্য সহকারে তাদের বুঝিয়ে তাদের মিথ্যা বলার প্রবণতাকে খর্ব করবেন।

www.pathagar.com

মনে রাখবেন, অপমান এবং বিব্রতবোধ ব্যাপারে শিশুমন ভীষণ সচেতন। অভিভাবক শাসন করবেন কিন্তু সেটি যেন দণ্ডদাতার প্রবল অত্যাচার না হয়।

বলতে দ্বিধা নেই, প্রায় সব শিশু কোনো না কোনো সময় চুরি করে থাকে। তবে চুরি করাটা কি তা না জেনে তারা সেটি করে। তারা ভাবে তাদের পছন্দের জিনিসটি নেয়ার অনুমতি চাইলে তা সে পাবে না। পাঁচ বছর বয়সের আগে শিশুরা একত্রে মিলেমিশে খেলে না। খেলতে শুরু করলে অন্য শিশুটির হাতে আকর্ষণীয় কোনো খেলনা থাকলে সেটি তুলে নেয়ার প্রবল বাসনা শিশুটিকে পেয়ে বসে এবং সুযোগ বুঝে হাতে তুলে নেয়। এ জাতীয় প্রবণতা থেকে শিশুটিকে রক্ষা করতে অভিভাবককে স্পষ্ট ভাষায় তাকে বোঝাতে হবে কাউকে না বলে অন্যের জিনিস গোপনে আনা গুরুতর অন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে তুলে আনা জিনিসটিকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে এবং অনুরূপ জিনিস শিশুটির হাতে দিয়ে আশ্বস্ত করতে হবে। Elezabeth Bowen বলেছেন, There is no end to the violation committed by children on children quietly talking alone.

ভালো করে লক্ষ করে দেখবেন, ৩-৫ বছরের শিশুরা মাঝেমধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। কখনো কখনো প্রতিশোধ-স্পৃহা তাদের উন্মুক্ত করে তোলে। প্রচণ্ডভাবে সামান্য প্ররোচনায় অস্থির হয়ে অন্যকে, স্কুলে সহপাঠীকে বুট দিয়ে আঘাত করে, কখনো চিৎকার করে নখ দিয়ে আঘাত করে থাকে। শিশুদের স্বভাব অনেকটা বিড়ালের মতো হিংস্র। ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকতে চায় না, কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না। ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করে, জানালার রড ধরে অনবরত ওঠানামা করে, অনবরত কথা বলে এবং সুযোগ পেলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়—যা স্বভাবত অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। এ অস্বাভাবিকতা অবদমিত করা বিশেষ জরুরি, কেননা এটি অভ্যাসে পরিণত হলে তা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলে এ কচিকাঁচা শিশুদের শারীরিক শাস্তি বিধেয় নয়। এতে উল্টা ফল হবে। শিশু একঘেয়ে হয়ে যাবে এবং যদি সে শাস্তি-ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে তাহলে সে একটি Angry Child হয়ে দাঁড়াবে।

তাছাড়া বর্তমানে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। দেখবেন কিছুসংখ্যক আলোচ্য বয়সের শিশু মা-বাবাকে বিশেষ করে মাকে রাগ হলে অথবা অভিমানাহত হলে মারতে থাকে। এ ব্যবহার তাদের অনুকরণপ্রিয় এবং শিখেছে অন্যের কাছ থেকে। অনেক সময় শিশুদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের জন্ম নেয় অসুস্থ

www.pathagar.com

পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও। মনে রাখতে হবে, Violen begets violence এমতাবস্থায় মা-বাবাকে শিশুটির সঙ্গে সংবেদনশীল কথাবার্তায় লিপ্ত হতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কের দৃষ্টিভঙ্গি শিশুর ওপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। পরিবারের সদস্য হিসেবে তার অধিকার আছে। সে অধিকার পদদলিত করলে চলবে না। সীমানা নির্ধারিত করলেও তার আবদার ও আবেগকে সম্মান দিতে হবে। দেখবেন তখন শিশুটির ঔদ্ধত্য কমে গেছে। শিশুটির মানসিক স্বাস্থ্যের সজীবতার যোগান দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত টিপস লক্ষণীয় :

১. শিশুটিকে পারিবারিক কলহ-বিবাদ থেকে দূরে রাখতে হবে

২. টেলিভিশনের হিংস্র দৃশ্যগুলো যাতে শিশুরা অনুকরণ না করে সেদিকে অভিভাবকদের সতর্ক হতে হবে

৩. শিক্ষাদানের নামে স্কুলে শিক্ষকদের শিশুর ওপর অত্যাচার করা চলবে না

৪. স্কুলে যাবার সময় মা শিশুদের পেট ভরে খেতে দেবেন। দেখা গেছে, যে শিশু ঠিকমতো আহার করে স্কুলে যায় সে স্কুলে খোশমেজাজে থাকে, মনোযোগী হয়, শেখে ভালো এবং তার অস্থিরতা পরিশীলিত হয়

৫. শিশুরা আদরের প্রত্যাশী। ভালোবাসা, আদরও ও ক্রমাগত মোটিভেশনই পারে তাদের চিত্ত জয় করতে। মনে রাখতে হবে A Child is not a vase to be filled but a fire to be lit.

উন্নত প্রযুক্তির রাজধানী : প্রাচ্যের ব্যাঙ্গালোর

ভারতের কর্নাটক রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯৪৯ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ নগরী উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। একদিন এ নগর ছিল টিপু সুলতানের গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ এটিকে সেনানিবাস হিসেবে গড়ে তোলে, আজ যা 'সিলিকন ভ্যালী' বা 'গার্ডেন সিটি' নামে খ্যাত। শহরটির নাম নিয়ে বিবাদ কম নয়। অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিকশনারির ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে বঙ্গভূমি (ল্যান্ড অব বেঙ্গলিজ)। এটি দেখে কর্নাটকের গভর্নর টি এন চতুর্বেদী গর্জে ওঠে এর প্রতিবাদ করতে সরকারকে নির্দেশ দেন। ডিকশনারির ব্যাখ্যায়

www.pathagar.com

বলা হয়েছে ১৫৩৭ সালে 'হয়শালা' রাজ্যের (বর্তমান কর্নাটক রাজ্যের অংশ বিশেষ) ক্যাম্পাগৌড়া নামীয় জনৈক স্থানীয় প্রধান কাঁদামাটি দিয়ে এক বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন এবং যেহেতু স্থানীয় লোকজন মুখ্যত বাংলা ভাষায় কথা বলতেন তাই তিনি জায়গাটির নাম রাখেন ব্যাঙ্গালোর।

বর্তমান পণ্ডিতবর্গ এসব গালগল্প অস্বীকার করে বলছেন, ব্যাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজের মাঝামাঝি হসুর রোডের পাশে বেগুর নামক জেলার নাম থেকে ব্যাঙ্গালোর শব্দটি এসেছে। অবশ্য অনেককে জিজ্ঞেস করে এর প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। আবার আরেক দল বলছেন নবম শতকে বেগুর জেলায় প্রচুর লোক 'বেঙ্গা' নামক গাছ দেখা যেত যা থেকে ব্যাঙ্গালোর শব্দটির উৎপত্তি। স্থানীয় লোকদের মতে, অতীতে বর্তমানের ব্যাঙ্গালোর বলা হতো 'ব্যানদাকালুরু'। যা হোক, বর্তমান সরকার স্বীকৃত শহরটির নাম 'ব্যাঙ্গালোর'।

কর্নাটকের ২৭টি জেলার অন্যতম ব্যাঙ্গালোর শহরের পরিধি ২১৯০ স্কয়ার কিলোমিটার এবং ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮ লক্ষ। শিক্ষিতের হার প্রায় শতকরা ৮৪ জন। সরকারি এক হিসেবে দেখা যায়, ২০১০ সালে ব্যাঙ্গালোরের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮৬ লক্ষ এবং গ্রামে হবে ২১ লক্ষ।

ব্যাঙ্গালোরের মুখ্য আকর্ষণ হচ্ছে এর শিক্ষা, চাকরি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা। মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান প্রয়োজন যৌবন শিক্ষা এবং রোজগার আর বার্ধক্যে সুচিকিৎসা। উত্তর-দক্ষিণে অন্যান্য শহরে কমবেশি এসব আছে। এত আরামপ্রদ আবহাওয়া আর নিম্ন অপরাধ প্রবণতা বোধ হয় ভারতের আর কোথাও নেই। তাই ব্যাঙ্গালোরের এত নামডাক এবং এত আকর্ষণ।

প্রতিদিন প্রায় ১৫০০টি মোটরগাড়ি ব্যাঙ্গালোরের পথে নামছে। বর্তমানে চলতি মোটরগাড়ির সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। গড়ে প্রতি মাসে একটি করে নতুন শিল্প স্থাপন হচ্ছে এবং তাল মিলিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা আর অপরাধ প্রবণতা। বলাই বাহুল্য ব্যাঙ্গালোরের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

ব্যাঙ্গালোর শহরের স্কুল, কলেজের প্রাচুর্য মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের দুর্বার গতিতে টানছে। অর্থের খেলা প্রতি পদে। প্রাইভেট কলেজের ছড়াছড়ি। বর্তমানে এখানে সাধারণ কলেজের সংখ্যা প্রায় ৪০০, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬১টি, মেডিকেল অ্যালোপ্যাথি ৬টি, আয়ুর্বেদিক ৮টি এবং ডেন্টাল ১৫টি, বিশ্ববিদ্যালয় ৭টি।

www.pathagar.com

এছাড়া অলিগলিতে হিসাবে বহির্ভূত অনেক কলেজ আছে। সাইনবোর্ডের বর্ণনানুযায়ী বেশির ভাগ কলেজ বিদেশের কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ফলত প্রচুর সংখ্যক অভিভাবক বা ছাত্র এগুলোতে আকর্ষিত হয়। বহুক্ষেত্রে অগুনতি টাকা পয়সা খরচ করে ভর্তি হবার দুই-তিন মাস পর কলেজে তালা ঝোলে এবং ছাত্ররা প্রতারিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট কেপিটেশন ফির একটি সর্বাধিক পরিমাণ বেঁধে দিয়েছে কিন্তু এগুলো শুধু কাগুজে বাঘ। প্রতি বছর বিশেষ করে পূর্বোত্তরের এবং বাংলাদেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। গত বছরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশের ৫০টি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কলেজের মাঝে ৬টি কলেজ ব্যাঙ্গালোরে। প্রথম দশের ভেতর মাত্র ১টি। এটি গুণানুযায়ী দশম স্থানে নাম ক্রাইস্ট কলেজ। এছাড়া ১৩ নম্বরে আছে সেন্ট জোসেফ কলেজ, ১৫ নম্বরে আছে কাউন্ট কারমেল কলেজ, ২৫ নম্বরে অক্সফোর্ড কলেজ অব সায়েন্স, ২৭ নম্বরে জ্যোতি নিবাস কলেজ এবং ৩৮ নম্বরে শ্রী ভগবান মহাবীর জৈন কলেজ।

সারাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঝে প্রথম পঁচিশে একটিও নেই। মেডিসিনে দেশের সর্বোত্তম ২৫টি কলেজের মধ্যে ৫ নম্বরে আছে মনিপালের কস্তরবা মেডিকেল কলেজ, ৯ নম্বরে সেন্ট জনস মেডিকেল কলেজ, ১৭ নম্বরে ব্যাঙ্গালোর মেডিকেল কলেজ এবং ২১ নম্বরে রামাইয়া মেডিকেল কলেজ। তবু প্রতি বছর ভর্তির মৌসুমে ছাত্র শিকারে এজেন্টরা দূর-দূরান্তের শহরে নগরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। পূর্বোত্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চল আসাম এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে গত ক'বছর ধরে দক্ষিণের কলেজগুলোর এজেন্টরা আসা-যাওয়া করছে। ৪-৫টি কলেজের হয়ে একজন প্রতিনিধি ঢাকা এসে এক নামিদামি হোটেলে বসে স্পট অ্যাডমিশন দিয়েছেন। কান পাতলে শোনা যায়, গত বছর ভর্তির মূল্য ছিল এমবিবিএস'র জন্য ১৫ লক্ষ, বিডিএস'র জন্য ৭ লক্ষ, বিই'র জন্য ১২ লক্ষ এবং পিজি'র জন্য ২৫ লক্ষ।

এছাড়া ঢাকায় স্থায়ীভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান অফিস খুলেছে যারা ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকার বিনিময়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য যথেষ্ট কার্যকরী আবার এমন ঘটনা বিরল নয় যেখানে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে লক্ষ টাকা খরচ করে ভর্তি হবার দু-তিন মাস পর হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। কর্নাটক সরকার স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এসব ব্যাপারে জনসাধারণকে প্রতিবছর সতর্ক করে দিচ্ছে। তবু কাকস্য পরিবেদনা। ভর্তির মৌসুমে ব্যাঙ্গালোরে হোটেলে সিট পাওয়া সহজ নয়। কিছু কিছু রাজ্য থেকে

www.pathagar.com

ছাত্র-অভিভাবকদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। অথচ গত বছর এ লেখকের পরিচিত এক ছাত্র ব্যাঙ্গালোরে এসে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বিডিএস-এ এক প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হয়েছিল। চারমাস পর কলেজটি কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন মহলের চাপে শেষে কেরলের অন্য এক কলেজের সাথে বন্দোবস্ত করে ছাত্রদের ভর্তি করে দেওয়া হয়। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়। কর্নাটকে অন্য দশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শিল্পে পর্যবসিত হয়ে গেছে।

হাজার হাজার ছাত্র জ্যামিতিক হারে প্রতি বছর এটা সেটা পাশ করে বেরোচ্ছে। তবু একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত স্থানীয় কর্মী পাচ্ছে না, ফলে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৪০ শতাংশ স্থানীয় এবং বাকি ৬০ শতাংশ অন্যান্য রাজ্যের বসবাস। ১০ ফুট একটি কোটরে ভাড়া মূল শহরে দশ হাজার টাকা। তাই বাধ্য হয়ে বহিরাগতরা যৌথভাবে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করছে, বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো অফিসের উপরের তলায় বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার (ডরমিটারি) ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ কাজ করো আর খাও। সাধারণত সকাল ৯টার আগে অফিসে হাজিরা দিলে ব্রেকফাস্ট বিনা খরচে, দুপুরে খাওয়া এমনিতে নামমাত্র খরচে প্রাপ্য এবং রাত ৮টায় অফিসে কাজ করলে রাতের খাবার বিনা খরচায়। তাই অবিবাহিতরা অফিস বাড়ি এক করে ফেলেছেন। তারা বলেন, এত খরচ দিয়ে পৃথক বাড়ি ভাড়া করার মানে হয় না। এতে করে অফিসে যাওয়া-আসার খরচও বেঁচে যায়।

সাধারণত দু'বছর কোনো প্রতিষ্ঠানে চোখ কান বুজে চাকরি করে পায়ের নিচের মাটি শক্ত হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে বেতনের ব্যাপারে দাম কষাকষি শুরু হয়ে যায়। যে কোনো কোম্পানি অভিজ্ঞ কর্মী চায়। তাই দু'বছরকে সেখানে বলা হয় 'সিজনিং পিরিয়ড'। সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা মাসিক ১০ হাজার টাকার চুক্তিতে চাকরিতে প্রবেশ করেন। দু'বছর পর যোগ্যতা দেখাতে পারলে এক লাফে ২৫-৩০ হাজারে পদোন্নতি এবং ৫-৭ বছর পর বড় বড় বিদেশী কোম্পানিগুলো অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন মেডিকেল খরচ, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি ছাড়াও বছরে ৩০-৩৫ লক্ষের অফার দেয়। আর তাই সেখানে নবনির্মিত তিন কোঠা বিশিষ্ট বহুতল দালানের ফ্ল্যাটগুলোর দাম শুরু হয় ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা থেকে। পত্রিকায় এভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় কিন্তু সঙ্গত কারণে এসব সরকারি চাকরিজীবীদের নাগালের বাইরে। এ ফ্ল্যাটগুলোর আবাসিকরা মুখ্যত বহুজাতিক কোম্পানির চাকরিজীবী

www.pathagar.com

এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী। ফ্ল্যাট বাড়ির চাহিদা এত বেশি যে মূল শহরের চারপাশের গ্রামগুলো দ্রুত শহরের পেটে ঢুকে যাচ্ছে এবং ১০-১২ তলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। প্রধানত আউটার রিং রোড, সারজাপুরা, বেলেনদুরা গেট, হোয়াইট ফিল্ড, বিটিএন, এইচ এস আর লে আউট, করমঙ্গলা, কুন্দনহাল্লি, দেবেনহাল্লি, ব্রুক ফিল্ড, ইয়ালাঙ্কা, মাইট ফিল্ড, হোপ ফার্ম, ইলেকট্রনিক সিটি, সান সিটি, হসুর রোড, ওল্ড মাদ্রাজ রোড প্রভৃতি অঞ্চলের চাহিদা বেশি।

ব্যাঙ্গালোরের প্রতি মানুষের আকর্ষণের অন্যতম কারণ এখানকার নিম্ন অপরাধ প্রবণতা। রাত বিরেতে মেয়ে-স্ত্রীরা একা বাইক নিয়ে কর্মস্থল থেকে ফিরছে বিনা ঝামেলায়। যদিও ইদানিং কিছু কিছু অঘটন ঘটছে এবং প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে সরকার বাধ্য করছে যাতে রাতের বেলা কর্মরত মহিলা কর্মীকে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। পত্রিকা মতে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে স্থানীয়রা মাত্র ৪০ শতাংশ আছে এবং বাকি ৬০ শতাংশ অন্য রাজ্যের। কন্নড়দের সুপ্ত অভিযোগ এটি।

ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়া খুব আকর্ষণীয়। সারাবছর ফুরফুরে হাওয়া। উষ্ণতা ১৭-১৮ ডিগ্রি থেকে ২৫-২৬ ডিগ্রির বাইরে যায়না। 'দ্য ব্রিতজ' পত্রিকার এককালের সম্পাদক আর কে করঞ্জিয়া ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে ব্যাঙ্গালোরে স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছিলেন এর মিষ্টি আবহাওয়া সুখ, শান্তি, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

নোবেল বিজয়ী স্যু-কি এবং মায়ানমার

মনোরম হ্রদের তীরে আভিজাত্যপূর্ণ একটি বাড়ি। যদিও যত্রতত্র উঁইপোকার আক্রমণ ঘটেছে, শাদা রঙ হয়েছে মলিন এবং দেওয়ালের পাথন খসে খসে পড়ছে, তথাপি বাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রাঙ্গণে কোমর অবধি গুল্ম রীতিমতো জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে এবং তারই মধ্যে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জনাকয়েক মালি ব্যস্ত বাগান সাজাতে। কিন্তু জেল তো জেলই, সে যতই দৃষ্টিনন্দন হোক না কেন। ইয়াঙ্গোনের এ দ্বিতল বাড়িতেই গত ১৭ বছর ধরে বন্দি রয়েছেন মায়ানমারের বিরোধী নেত্রী আং সান স্যু-কি। গণতন্ত্রের জন্য আপসহীন লড়াইয়ের সুবাদে যাকে কার্যত সারাবিশ্ব শ্রদ্ধা করে, সে স্যু-কি ১৯৯৫ সালের জুলাইয়ে মাত্র তিন মাসের জন্য মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই তাঁকে ফের

www.pathagar.com

গ্রেপ্তার করা হয়। মায়ানমারের শাসক সামরিক জুন্টা স্যু-কির প্রতি এতটাই নির্দয় যে লন্ডনে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরও একটি বারের জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবে নি তারা।

৩০ অক্টোবর ২০০৭ স্যু-কি ৬২ বছরে পদার্পণ করলেও তাঁর মনের অসীম সাহস এখনো দীপ্যমান এবং অক্ষত। সর্বদা পরিধান করেন মায়ানমারের (বার্মা) পরম্পরাগত পোশাক। তাঁর মুখাবয়ব থেকে সদাই ঠিকরে বেরিয়ে আসে অন্তর্নিহিত প্রশান্তি এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি। দেখতে রোগা হলেও দেহাবয়ব দৃঢ় এবং ঋজু। স্যু-কি বিশ্বাস করেন যে মায়ানমারে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। দেশের এ বিরোধী নেত্রী যিনি গত দু'দশকের কাছাকাছি সময় ধরে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন, আশ্চর্যজনক হলেও সত্য সামরিক শাসকদের প্রতি তার কোনো শত্রুতামূলক বা ঘৃণার মনোভাব নেই। এক ধরনের ক্ষমার মনোভাব তাঁর মধ্যে কাজ করে।

স্যু-কি বলেন—'সত্যি বলছি, জেলে একাকি আত্মমগ্ন হয়ে কাটাতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এ-কথা ঠিক, আমি আমার পরিবার এবং আমার সহযোগীদের অভাব ভীষণভাবে অনুভব করি। কিন্তু আমি এসব নিয়ে ভাবতে চাই না, কারণ আমি জানি, অনেক লোক আছেন যারা আমার চেয়ে আরো অনেক বেশি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।'

বন্দি অবস্থাতেও এক রুটিনবদ্ধ এবং কঠোরভাবে আধ্যাত্মিক বাতাবরণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন কাটাচ্ছেন মায়ানমারের এ সংগ্রামী নেত্রী। খুব সকালে অর্থাৎ সাড়ে চারটায় শয্যা ত্যাগ করেন তিনি। এরপর একঘণ্টা ধরে চলে বৌদ্ধ উপাসনা। তাঁর মতে, ভোরে চরাচর খুবই নীরব ও শান্ত থাকে, ফলে ধ্যানের জন্য এ সময়টা খুবই উপযোগী।

প্রাতঃরাশের পর শুরু হয় স্যু-কির অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম। দুনিয়ার তাবৎ খবরের জন্য এখনো তাঁর ভরসা এক অমূল্য শর্ট-ওয়েব রেডিও। রেডিওতেই তিনি শোনেন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ভয়েজ অব আমেরিকা এবং ডেমোক্রেটিক ভয়েজ অব মায়ানমার। শেষোক্ত রেডিও প্রোগ্রামটি প্রচারিত হয় নরওয়ে থেকে। গত ১৭ বছর ধরে বিশ্বে যত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটে গেছে, তার খবরাখবর তিনি পেয়েছেন একমাত্র এ রেডিওর মাধ্যমে। কমিউনিজমের বিদায়, জেল থেকে নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি—এসব খবরের সূত্র একমাত্র রেডিও। ম্যান্ডেলার মুক্তি বিশেষভাবে স্যু-কির কাছে এক প্রেরণাদায়ক ঘটনা।

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনভার যেভাবে যুক্তিপূর্ণ ও শান্তির পরিবেশের মাধ্যমে বর্ণবাদীদের জাত থেকে কৃষ্ণকায়দের কাছে হস্তান্তর হয়েছে, এ ঘটনাকে মায়ানমারের ক্ষেত্রেও এক উদাহরণ হিসেবে দেখতে চান এ সংগ্রামী নেত্রী।

স্যু-কি এক সাক্ষাৎকারে ফিরে আসেন তাঁর সে প্রাথমিক জীবনে। বলেন—'প্রতিদিন অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকে কিন্তু সব শেষ করা সম্ভব হয় না। অনেকে মনে করবেন বন্দি অবস্থায় কর্মহীন জীবনে সময়ের এত অভাব কোথায়? কিন্তু আমি শত শত বই পড়ি। এর মধ্যে রয়েছে জীবনী, রাজনীতি এবং কাব্যগ্রন্থ। এ সময় আমি পড়ছি টিই লরেন্সের সেভেন পিলার্স অব উইসডম'।

স্যু-কির বন্দিজীবনের প্রথম দু'বছর তো সামরিক শাসকরা তাঁর স্বামীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। সেটা ছিল ১৯৯০ থেকে ৯২ সাল। এরপর অবশ্য প্রতি ছয় মাসে স্বামীকে একবার করে আসার সুযোগ দেয়া হতো। খুব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে স্যু-কি জানান, 'আমার স্বামী আমাকে এ বলে বকুনি দিতেন যে আমি নাকি খুবই কম খাচ্ছি। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি নিয়মিত খাই, কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে নয়। আসলে এক একা থাকলে খাওয়ার ইচ্ছা চলে যায়। কিন্তু আগে রান্নার বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। আর আমার খাওয়া-দাওয়াটা হচ্ছে একেবারে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে। ভাত, মাছ এবং শাক-সবজি হচ্ছে আমার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অঙ্গ।'

স্যু-কির সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত বেদনার কারণ হলো, তাঁর বড় দুই ছেলে কিশোর অবস্থা থেকে যখন বড় হলো তখন তিনি এদের পাশে থাকতে পারেন নি। বড় ছেলে আলেকজান্ডারের বয়স বর্তমানে ৩৩। পূর্ব ইউরোপে শিক্ষক। ছোট ছেলে কিমের বয়স বর্তমানে ২২। অক্সফোর্ডে বড় হয়েছে, সেখানে তিনি একটি স্টুডেন্ট রক ব্যান্ডের সদস্য। বাবার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

মায়ানমারের সামরিক শাসকগোষ্ঠী প্রায়ই ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ দাঁড় করাত স্যু-কির বিরুদ্ধে। তাঁকে মায়ানমার বিরোধী এবং ব্রিটিশ অনুগামী বলে নিন্দে-মন্দ করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে যারা বন্দি করেছে, সে সামরিক শাসকদের প্রতি কোনো ধরনের ঘৃণার মনোভাব পোষণ করেননি এ বিরোধী নেত্রী। স্যু-কি তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন—'আমার রক্তের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক রয়েছে। আমার বাবার মাধ্যমে সে সম্পর্ক, যিনি বার্মা

www.pathagar.com

বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আজো বাড়ির ফটো এ্যালবাম যখন দেখি তখন আমার বেশির ভাগ ফটোতেই লক্ষ করি পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সামরিক পোশাকে সজ্জিত আমার বাবা। ফলে সেনাবাহিনীকে আমার পরিবারের একটি অংশ বলে মনে করাটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।'

বার্মার স্বাধীনতার জনক জেনারেল আউং সান ১৯৪৭ সালে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে যখন মারা যান, সে সময় স্যু-কির বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। আউং সান নিহত হন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মাস কয়েক পর, যখন ইয়াঙ্গোনে তিনি এক সভায় পৌরোহিত্য করছিলেন। মায়ানমারে আজো তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। নিহত এ নেতার ভাবাদর্শ আজো স্যু-কির চলার পথে শক্তির উৎস।

মায়ানমারে যুদ্ধপরবর্তী যুগে পা রেখে স্যু-কি অবশ্য কঠোরভাবে গান্ধীজির অহিংসার মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। কিন্তু এর আগে এমনটা ছিলেন না আমাদের প্রতিবেশী দেশটির এ বিরোধী নেত্রী। একসময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদেরকে আলোচনা অথবা চরম সংগ্রাম—তার একটিকে বেছে নিতে হবে।' সমঝোতা নামক শব্দের কোনো স্থান তাঁর রাজনীতিতে ছিল না। কিন্তু সময় পালটেছে, আজ ১৮ বছর পর স্যু-কি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নকে বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছেন। একেবারে নরম মনোভাব বজায় রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। কোনো ধরনের প্ররোচনামূলক কাজ এবং কথাবার্তায় তিনি একেবারেই রাজি নন। বর্তমান অবস্থায় এমনকি চোখের ডাক্তারের কাছে যেতেও সঙ্গে থাকছে সেনাপ্রহরী।

স্যু-কি গৃহবন্দি অবস্থায় থাকলেও ১৯৯০ সালের নির্বাচনে তাঁর দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি বিপুলভাবে জয়ী হয়। কিন্তু সামরিক জুন্টা এ ফলাফলকে পাত্তা দেয়নি। উলটো নব-নির্বাচিত সাংসদদের দলে দলে জেলে আটকে রাখে। অবশ্য থাই সীমান্ত দিয়ে যেসব গণতন্ত্রপন্থী পালিয়েছিলেন, তারা জেলে যাওয়া থেকে রক্ষা পান।

দেশের সেনা-অধিনায়করা অবশ্য এখন এক বাজি খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে সেনার মুঠোয় এমন মজবুত শাসন ব্যবস্থা রয়েছে যে এ অবস্থায় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এ 'জননীকে' যদি সাধারণ সমাজের সঙ্গে পুনরায় মেশার সুযোগ দেওয়াও হয় তাতে ক্ষতির কিছু থাকবে না। কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছেন না সামরিক অধিনায়করা। মন স্থির করতে

www.pathagar.com

না-পারার কারণ হলো, সামরিক শাসকগোষ্ঠী মনে করছেন স্যু-কি একবার বাইরে বেরিয়ে এলে সারাদেশে অস্থিতিশীলতার পরিবেশ কায়েম হবে।

স্যু-কি বলেন, সামরিক শাসকদের ধারণা তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে খুবই জরুরি বিদেশী সহায়তারাশি এসে পৌঁছোবে মায়ানমারে, যা ১৯৮৮ সালের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। জাপান তো ঋণ দিতে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু ইয়াঙ্গোন শাসকবর্গের সুদূরপ্রসারী লক্ষ হলো, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের লগ্নি। আন্তর্জাতিক রেডক্রস বলছে, স্যু-কি মুক্তি পেয়ে গেলে তারা মায়ানমার ত্যাগ করার কথা ভাববে। কারণ সামরিক শাসকরা অন্য কোনো বন্দির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হতে দিচ্ছে না।

স্যু-কি বলেন, 'সারা বিশ্ব যে মায়ানমারে গণতন্ত্র ফেরানোর জন্য চেষ্টা করছে, এতে আমার প্রতি বা গণতন্ত্রের প্রতি তাদের সহনশীলতাই আমি অনুভব করছি কিন্তু এর জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে এটা দেখার বিষয়। সেদিন জাতিসংঘের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। এরপর তিনি সামরিক শাসকদের সঙ্গেও দেখা করে কথা বলেছেন কিন্তু এর চূড়ান্ত ফলাফল কি দাঁড়াল আমি জানি না।'

পৃথিবীর যেসব দেশে দমনমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, এর মধ্যে কঠোরতম হচ্ছে মায়ানমার। সর্বত্র গোয়েন্দাদের ছড়াছড়ি যেমন—স্থানীয়, তেমনি সেনাবাহিনীর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার জাল ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। দর্শকরা যখন স্যু-কির সঙ্গে হ্রদের পাশে সে বাড়িতে দেখা করতে যান তখন এ এজেন্টরা দর্শকদের পিছু নেয়, বারবার ছবি তোলে।

কিন্তু বিরোধী নেত্রী এ বন্দিদশাতেও যথেষ্ট শান্ত এবং সংযত। তাঁর কাছে এ বছরগুলো এক ব্যতিক্রমী বলে মনে করেন তিনি, যে অভিজ্ঞতা সবার হয় না। তাঁর বিশ্বাস, যেদিনই তিনি মুক্তি লাভ করুন না কেন, তাঁর জীবনদর্শন তো পালটাবে না, বরং তা আরো দৃঢ় এবং সমুন্নত হবে।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি ও গুণীজনের মন্তব্য

দেশের কোনো-না-কোনো পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন যার অন্তত একটা লেখা প্রকাশিত হয়, যার লেখার ব্যাপ্তি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, ধর্ম থেকে ব্রহ্ম, রাজপ্রসাদ থেকে কুঁড়েঘর, আলো থেকে অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, সত্য-মিথ্যা, হাসি-আনন্দে ভরা, শুধু কি তাই, দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সীমানায় নোঙর করেন—রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, বৃক্ষ, বাণিজ্য, ঐতিহ্য, মনন, মেধা, আবিষ্কার, পরিবেশ বাস্তবতা এ-সবের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ দেন, তিনি ধীমান এবং সব্যসাচী লেখক-সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী।

১৯৫০ সালের ১৫ এপ্রিল সিলেটের এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শী, ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী, স্বাধীনচেতা, কঠোর পরিশ্রমী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সততা, অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, সিদ্ধান্তে স্থিরতা, সময়ানুবর্তিতা-সময়ের কাজ সময়ে করাকেই তিনি পছন্দ করেন। তার কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য নেই এটাই তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আফতাব চৌধুরী শিক্ষাবিদ নন—শিক্ষানুরাগী, রাজনীতিবিদ নন-রাজনীতি সচেতন, প্রচলিত ধারার কৃষক না-হয়েও কৃষিবিদ। তিনি বৃক্ষবিদ, পরিবেশবাদী। জীবনের সিংহভাগ সময় সাংবাদিকতা, লেখালেখি ও বৃক্ষের কাছাকাছি থেকে বৃক্ষের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং তিল তিল করে জমা দিয়ে জমা করে মহীরুহ হয়েছেন। মানবতার কল্যাণে এমন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের আজকাল বড়ই অভাব। নিজের হাতে লাগানো ও বিলিয়ে দেয়া হাজারো বৃক্ষছায়ায় ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম নেয়ার দৃশ্য নিজেকে যতটুকু আনন্দ দেয়, গর্বিত করে তার চেয়ে শতগুণ। গর্ববোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন ঐ গাছের ফুল বা ফল মানুষের জন্য উপভোগ্য হয়। শুধু উপভোগ্যই নয় যখন রোপিত হাজারো গাছের ফল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায় তখন

www.pathagar.com

তার আর আনন্দের সীমা থাকে না। আফতাব চৌধুরীর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নেই। তিনি তা দেখে দারুণভাবে খুশি হন, আনন্দ পান।

আফতাব চৌধুরীর প্রকাশিত প্রথম বইয়ের নাম *'ইদানিং'*। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের প্রকাশক বাংলাদেশ সরকারের কর বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা মোহাম্মদ হায়দার খান। তিনি লিখেছেন :

> 'আমি লেখক নই, পাঠক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আফতাব চৌধুরীর লেখায় সমাজের সম-সাময়িক সজীব চিত্র দেখে আমি পাঠক হিসেবে মুগ্ধ হই। তিনি লেখক এবং সাংবাদিক। জানতে পারি আরো কিছু পরিচয় তিনি সৎ ও একজন সফল ব্যবসায়ী। সর্বোপরি সংবেদনশীল হৃদয়বান সমাজসেবী এবং বৃক্ষপ্রেমিক। আমার কাছে অবশ্য তার লেখকসত্তার পরিচয়ই বড়। পুস্তকে সংকলিত নিবন্ধগুলো চলমান সময়ের একটি ছবি। কোথাও কোথাও ক্ষোভ এবং ঝাঁজ আছে, তবে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তাই আশা করি, পাঠক বৃহত্তর স্বার্থে তিক্ত মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণকে উদার চিত্তে গ্রহণ করবেন।'

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *'সত্যের মুখোমুখি'*। এ-বইয়ের ভূমিকায় বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তফা কামাল লেখেন :

> 'সমাজ, সভ্যতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা থেকে কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ তুলে ধরেন তাদের সৃষ্টিকর্ম। সাংবাদিক আফতাব চৌধুরীর লেখালেখির বিষয়বস্তু সমাজ ও সমাজের মানুষ। আমাদের চারপাশে হাজারো সমস্যা ঘিরে আছে। এসব সমস্যা ও সম্ভাবনাই আফতাব চৌধুরীর লেখালেখির বিষয়-আশয়।
>
> বৈরী সমাজের সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর লেখক, কবি, সাহিত্যিক সুকৌশলে দেশের যুবসমাজকে নিমজ্জিত করছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে অসভ্যতা ও বেহায়াপনার অতল গহ্বরে। আফতাব চৌধুরী স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের প্রয়াসে নিবেদিত। তিনি নিষ্ঠাবান লেখক, সাংবাদিক ও বৃক্ষপ্রেমিক। তার এ একের ভেতর তিন কাজগুলো কোনো বিলাসিতা নয়। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই তিনি তার স্বার্থক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন।'

www.pathagar.com

আফতাব চৌধুরী একজন সৎ, সফল ও সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ। তিনি দীর্ঘদিন থেকে সিলেট প্রেসক্লাবের সঙ্গে জড়িত থেকে পরপর ৬ বার সিনিয়র সহ-সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করেন। আফতাব চৌধুরী এখন সিলেট প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য। তিনি বাংলা একাডেমীরও আজীবন সদস্য। আফতাব চৌধুরী বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ঢাকা ও সিলেট, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সমিতি, জালালাবাদ অন্ধ কল্যাণ সমিতি, সিলেট রাইফেলস ক্লাব, জালালাবাদ ইতিহাস ও গবেষণা পরিষদ, সিলেট মোবাইল পাঠাগার, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ ঢাকা, নজরুল একাডেমি, জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি, কবি দিলওয়ার পরিষদ, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি সংস্থার জীবন সদস্য। তিনি জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সরকারি পাইলট হাইস্কুল, পুলিশ লাইন হাইস্কুল, ক্যান্টনমেন্ট কিশলয় কিন্ডার গার্টেন, মডেল হাইস্কুল, মিরাবাজার, শাহ মীর মাজার পরিচালনার কার্যকরী কমিটির সদস্য। আফতাব চৌধুরী সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের বেসরকারি পরিদর্শক, জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য। আফতাব চৌধুরী ট্রাস্টি কোর্ট প্রাঙ্গণ জামে মসজিদ, সিলেট শিক্ষা ট্রাস্ট, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য। এছাড়া তিনি শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শাহজালাল উপশহর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, সিলেট কলেজ, যুব পর্যটন ক্লাব, পাঞ্জেরী যুব সংঘ, সরকারি শিশু সদন রায়নগর, বৃক্ষমেলা কমিটি, রকীব শাহ পরিষদ, বৃক্ষ রোপণে প্রধানমন্ত্রীর ট্রফি প্রদান কমিটি, উপশহর এ ব্লক জামে মসজিদ কমিটি, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ কমিটি, রোগী কল্যাণ সমিতি, ওসমানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ইমদাদুল হক পাঠক ফোরাম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি, সুরমা মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদ, মৎস্য বিভাগ জেলা কমিটি, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক পরীক্ষার ভিজিলেন্স টিমের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নীরব পৃষ্ঠপোষক। সংস্কৃতিমনা আফতাব চৌধুরী রেডিও বাংলাদেশের একজন নিয়মিত কথক। জাতীয় মাধ্যম টিভিতেও তিনি মাঝে মধ্যে প্রোগ্রাম করে থাকেন। এছাড়াও ইমাম ট্রেনিং একাডেমীসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পাঠদান করে থাকেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাঁর নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতা এবং রুচিস্নিগ্ধ জীবনযাপন সকল মহলে নন্দিত। ভ্রমণ করা, বাগান করা, লেখাপড়া, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ তার নেশা। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক

www.pathagar.com

অত্যন্ত নিবিড়। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে তার সুনিবিড় সম্পর্ক ও হৃদ্যতা রয়েছে—যা সর্ব মহলে বহুল প্রশংসিত। জাঁকজমক বা বিলাসিতা নেই। নেই অহংকার বা অহমিকা। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও ভ্রমণ বিলাসী। ব্যবসা, সাংবাদিকতা ও সরকারের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, দুবাই, আবুধাবী, চীন, ওমান, বাহরাইন, লেবানন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। *সত্যের মুখোমুখি* বইয়ের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে কথা সাহিত্যিক শাহেদ আলী বলেন :

> 'আফতাব চৌধুরী একজন আত্মপ্রত্যয়ী লেখক এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। তার লেখাগুলোতে স্বচ্ছ মনের প্রতিফলন দেখা যায়। তার লেখায় হট্টগোলের অবকাশ নেই, নিরপেক্ষতা আছে। আছে স্বচ্ছতাও। তিনি কোনো দলগত ভাব বা আদর্শে লেখেন না। এটা এক মহৎ উদ্যোগ। কারণ, কোনো পক্ষ বা দল তাকে কালিমালিপ্ত করার সুযোগ পাবে না। তিনি এ ঝুঁকির উর্ধ্বে। এটা তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করার কথা নয়। তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নিরলসভাবে লিখে চলেছেন। সিলেট অঞ্চলে বৃক্ষরেপাণ, রক্ষণাবেক্ষণ পরিচর্যা ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ করে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। তিনি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ মাদ্রাসায় গাছের চারা পাঠিয়ে থাকেন। নিজ ব্যয়ে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মধ্যে নারিকেলসহ নানা জাতের গাছের চারা বিতরণ করেন বলে আমি খবর পেয়েছি যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।
>
> ঢাকায় বসে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় কলম সৈনিক আফতাব চৌধুরীর লেখা পড়ি আর আমিও সে সুযোগের চিন্তা করি। জানি একজন আফতাব চৌধুরী কারো অনুপ্রেরণা, আর্থিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে শিরোনামমুখী না-হয়ে আমাদের কালের ইতিহাসে সুন্দর, অধ্যবসায় এবং সফলতার একচিলতে জায়গা করে নিয়েছেন। পরবর্তী সময় এবং প্রজন্মের জন্য যা ইতিহাস হিসেবে পরিণত হবে।'

তৃতীয় গ্রন্থ *আলোর সন্ধানে* ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তার মন্তব্যে বলেন :

www.pathagar.com

হাল আমলে সাংবাদিকতা, সাহিত্য সাধনা, পত্র-পত্রিকায় নন্দিত কলাম লেখা, সমাজসেবা, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আফতাব চৌধুরী সুধী মহলের প্রশংসা ও পরিচিতি লাভ করেছেন। তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বহুভাবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছেন।

দেওয়ান সাহেব বলেন, 'পাঠক সমাজ আফতাব চৌধুরীর লেখা পাঠে বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়ে থাকেন। তার লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখক যেভাবে যা বুঝেছেন এর বিশদ ব্যাখ্যা নয় এর চুম্বক রেখাচিত্র তার লেখায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

লেখকের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল, কোথাও জড়তা বা হেঁয়ালি নেই। প্রত্যেকটি লেখায় একটি পরিচ্ছন্ন ভাব ও দরদি মনের ছাপ পাওয়া যায় যা একজন লেখকের লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'

প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষাকারী আফতাব চৌধুরী সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। প্রতিভাধর আফতাব চৌধুরী নেশা ও পেশা উভয় ক্ষেত্রে অকৃত্রিম ও আন্তরিক। সবচেয়ে বড় কথা তার নেশা ও পেশা সর্বাবস্থায় দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর'।

বইটি হাতে নিয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ওলট পালট করে দেখে ও পড়ে দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন :

'সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী খানদানি পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষিত মানুষ। সাংবাদিকতাকে নেশা হিসাবে নিয়ে থাকলেও স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তার লেখার মধ্যে আছে আবেগ-অনুভূতি। ভাষা অত্যন্ত মোলায়েম। বইটি পড়ে আন্দাজ হলো তার মধ্যে নানা রকম প্রতিভা লুক্কায়িত আছে এবং একদিন তা প্রকাশ পাবে। সমাজ ও জাতির কাজে লাগবে। বৃক্ষরোপণের জন্য তাঁকে মূল্যায়ন করে জাতীয় স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়েছে এজন্য আমি খুশি হয়েছি। ক'জনের ভাগ্যে এ সম্মান জোটে? তিনি বলেন, শুধু বৃক্ষপ্রেমই নয়, সমাজ ও দেশের সার্বিক কল্যাণে তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন কলমযোদ্ধা। আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

www.pathagar.com

আশা করি তার পরশ থেকে দেশ ও জাতি আরো নানাভাবে উপকৃত হবে।'

২০০১ সালে প্রকাশিত আফতাব চৌধুরীর ৪র্থ গ্রন্থ *'ইতিকথা'* গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে গণমানুষের কবি দিলওয়ার বলেন :

গ্রন্থখানি লিখেছেন জীবনের প্রতি পরোক্ষভাবে একান্ত অনুরক্ত প্রিয় মানুষ আফতাব চৌধুরী। তার আরো পরিচয় আছে। তিনি সাংবাদিক, কলামিষ্ট, সমাজসেবী, নিবন্ধকার, বৃক্ষপ্রেমিক ইত্যাদি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ জন্যে স্বীকৃতিসহ পুরস্কৃতও হয়েছেন। বৃহত্তর সিলেটে সম্পদের অধিকারী হয়েও যে ক'জন ব্যক্তি লেখালেখির মাধ্যমে সমকালের ধারায় নিজেদের নাম উল্লেখযোগ্যভাবে রেখে যেতে চান আফতাব চৌধুরীকে তাদের একজন বলে গণ্য করা যায়।

আফতাব চৌধুরী ১৯৭৫ সাল থেকে অব্যাহতভাবে চুটিয়ে লিখছেন। সময় একদিন নির্ধারণ করবে তার লেখাগুলোর প্রকৃত গুণাবলী। তবে আমি বলতে বাধ্য যে, তাঁর হাত থেকে মুষল ধারার শব্দের বৃষ্টিবর্ষণ দেখে আমি কিছুটা বিস্ময় বোধ করেছি এবং এখনও করি।

কবি দিলওয়ার মি. চার্চিলের রচনা থেকে এক অমর উক্তি উদ্ধৃত করেন, This is not the End, This is begining of the end. অর্থাৎ এটা শেষ নয়, এটা সমাপ্তির শুরু।

সর্বশেষ তিনি প্রীতিভাজন আফতাব চৌধুরীর লেখনীর সৃষ্টি ক্ষমতাকে অভিনন্দিত করে জাতীয় মানসিকতার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি কামনা করেছেন।

আফতাব চৌধুরীর পঞ্চম গ্রন্থ *'জীবন ও জগৎ'* বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে। বইটি পড়ে দেশের প্রবীণ সাংবাদিক ও বাংলাদেশ অবজারভারের প্রাক্তন সম্পাদক জনাব ওবায়েদ উল হক বলেন, বইটির লেখক দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক। তার সাথে আমার পরিচয় ৮০'র দশক থেকে। মাঝেমধ্যে তিনি বাংলাদেশ অবজারভারেও লিখতেন। ১৯৮০ সালে আমরা একই সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চীন ভ্রমণের সুযোগ পাই। চীন থেকে ফিরে এসে তিনি সিলেট ঢাকা পিকিং-সিলেট শিরোনামে একটি ভ্রমণকাহিনী লেখেন, ঢাকার কোনো এক জাতীয় পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি পড়ে আমি মন্তব্যে লিখেছিলাম আফতাব চৌধুরী একদিন দেশের একজন খ্যাতনামা লেখক

www.pathagar.com

হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন, আজ তাঁর লেখা *'জীবন ও জগৎ'* বইটি পড়ে তার প্রতিফলন অনুভব করলাম। অশেষ অভিনন্দন আফতাব চৌধুরীকে। আমি তাঁর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান বলেন, সাংবাদিক আফতাব চৌধুরীর *'জীবন ও জগৎ'* বইটি পড়লাম। বইটির লেখার মান অনেক উন্নত এবং বিষয়ভিত্তিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে লেখা বইটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল, উপস্থাপন চমৎকার। আফতাব চৌধুরীকে আমি জানি ১৯৬৬ সাল থেকে। তিনি তখন ছাত্র আর আমি সিলেটের জেলা প্রশাসক। মাঝে মধ্যে আসতেন, কথা বলতেন, জানার আগ্রহ ছিলো, শেখার ছিলো ইচ্ছা। বইটিতে জানার এবং শেখার অনেক কিছু আছে। বিভিন্ন বিষয়ে রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগনো যায়। যে কেউ বইটি পড়লে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। বইটি সংরক্ষণে রাখলে ভবিষ্যতে গবেষণামূলক কাজে লাগবে।

দেশ জাতির স্বার্থে তিনি আফতাব চৌধুরীর সুস্থ, সুন্দর জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন। সমাজসেবী আফতাব চৌধুরীর প্রকৃতি ও পরিবেশের উন্নয়নে অবদান সর্বমহল স্বীকৃত এবং প্রশংসিত।

আফতাব চৌধুরীর ৬ষ্ঠ গ্রন্থ *'কৌতুক'*। এ গ্রন্থে লেখকের বহুদিনের অনুসন্ধানী শ্রমের ফসল ৪৭০টি হাস্য কৌতুক স্থান পেয়েছে। এ কৌতুকগুলো নিছক হাস্যকৌতুক নয়। এতে লুক্কায়িত রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়-আশয়। রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভব এ বিষয়ে বলেছেন :

আমারে পাছে সহজে বুঝ
তাইতো লীলার ছল
বাহিরে যার হাসির ছটা
অন্তরে তার অশ্রুজল।

আমাদের সমাজ জীবনে হরহামেশা ঘটে যাওয়া ব্যতিক্রমধর্মী সংগৃহীত হাস্যকৌতুকগুলো পাঠককে নির্মল আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কৌতুক বইটি পড়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, ডাক ও তার বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট রম্যলেখক আতাউর রহমান বলেন,' হাসাহাসি সম্পর্কে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানীগুণী অনেক গুরু-গম্ভীর

www.pathagar.com

কথাবার্তা বলে গেছেন।' যেমন হাসির রাজা মার্ক টোয়েন বলেন :

> 'মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে হাসে এবং যার হাসির প্রয়োজন আছে।'

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আফতাব চৌধুরীর লেখা *'কৌতুক'* বইখানা পাঠ করতে গিয়ে উপর্যুক্ত কথাগুলো বার বার আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো।

মনে হলো শত ব্যস্ততার ভেতরও আফতাব চৌধুরী হাসাহাসিকে পছন্দ করেন, হাসাতেও আনন্দ পান। তার মধ্যে যে ব্যতিক্রমী প্রতিভা বর্তমান তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমস্যা জর্জরিত এ সমাজের মানুষকে হাসিয়ে বিমল আনন্দ প্রদানের নিমিত্তেই লেখকের এ প্রয়াস। ইতিমধ্যেই বইটি প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে, প্রশংসিত করেছে এর সম্পাদককে। পরিচিতি ও জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে নির্দ্বিধায় বলা যায় আফতাব চৌধুরীর প্রয়াস সকলও সার্থক হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক কবি ও গীতিকার ড. মনিরুজ্জামান কৌতুক বই পড়ে মন্তব্যে লেখেন আফতাব চৌধুরীর বিভিন্ন রকম প্রতিভা আমাকে অভিভূত করেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমি তার লেখার কলাম বিশেষ করে পরিবেশ সংক্রান্ত লেখা নিয়মিত পড়ে থাকি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় বাংলা একাডেমীতে বার্ষিক জলসায়, তখন তিনি আমাকে বইটি উপহার দেন। বইয়ে তার পরিচয় ও গুণীজনের মন্তব্যগুলো আমি আদ্যপ্রান্ত পড়ে নিই। মনে হলো তিনি শুধু স্বনামধন্য সাংবাদিক ও কলামিস্ট বা পরিবেশবিদ নয়, তার সদাচরণ ও সহজ চলাফেরার জন্য সকলে তাকে আদরের চোখে দেখেন। আমি তার সাফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে দোয়া করি।

আফতাব চৌধুরী একজন ভালো মানুষ। সময় তাকে শিখিয়েছে মানুষকেও ভালোবাসতে। আর মানুষকে ভালোবাসা মানেই পৃথিবীকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা অপরিহার্য। সুন্দর পরিবেশের প্রথম এবং প্রধান শর্ত গাছপালা, পশু-পক্ষীকে ভালোবাসা, শোভিত সবুজ সুশীতল ছায়া সৃষ্টি করা। তাইতো সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে সবুজের সমারোহ। ফলজ, বনজ, ঔষধি, কাঠ উৎপাদনকারী, অলংকার, ফ্যাশন, নান্দনিক ও লাকড়ি গাছে ছেয়ে আছে বসতবাড়ি, সামাজিক লোকালয়,

www.pathagar.com

সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও জনপদের পাশে এমনকি স্বীয় এলাকা শাহজালাল উপশহরেও। এসব স্থানে সবুজ সমারোহ সৃজিত গাছগুলো তাদের মৌনতা, দৃঢ়তা, সাম্যতা ভবিষ্যতের সীমাহীন প্রতিশ্রুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র একটি মানুষের দৃঢ় স্বপ্নের ফসল এরা। সে মানুষটির সুন্দর মন ও নরম দুটো হাতের পরশে আর যত্নে তাদের লালন পালন ও বেড়ে ওঠা। প্রায় প্রতিদিনই তাদের দেখা হয় সে মানুষটির সাথে। তিনি তাদের সাথে কথা বলেন, খোঁজ-খবর নেন। তাদের দুঃখ-কষ্টের তত্ত্বাবধানে বেড়া ও খাঁচা স্থাপন, সার প্রয়োগ, আন্তপরিচর্যা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন অতীব যত্নের সাথে।

সাংবাদিকতা, পত্রপত্রিকায় লিখে, বাংলাদেশ বেতারে কথিকা পাঠ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠ দান করে যে সম্মানী পান তা বৃক্ষরোপণে ব্যয় করেন। বই লিখে যে আয় হয় তার পুরোটাই তিনি ব্যয় করেন সবুজের সমারোহ সৃষ্টি করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তিনি আজীবন এ মহৎ কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। সেসব দেশ সফরকালে বৃক্ষরাজির সাজানো বাগান, বৃক্ষের সুন্দর সৌকর্যপনা, দরদি দায়িত্বপনা তাকে দারুণভাবে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের নবী করিম (সা.) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা করেছেন একথা তিনি প্রায়ই বলে থাকেন উদাহরণ হিসেবে। এসব কিছু তাকে বৃক্ষপ্রেমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন।

আমাদের নিজেদের পরিবার, পরিজন, সমাজ, দেশ জাতিকে বাঁচানোর তাগিদে আফতাব চৌধুরী পরিবেশ তারকা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তার মতে আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে, তেমনি পরিবেশ বাঁচলে এ ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীটাও বাঁচবে।

মানবধর্মের কল্যাণনিষ্ঠ আফতাব চৌধুরী মনে করেন, ইটের জঙ্গল সৃষ্টি করার জন্য কৃষিভূমি ধ্বংস, পাহাড় ও টিলা নিধন, বনভূমি উজাড়, অতিথি পাখি বধ, বিষাক্ত বর্জ্যে অঘটন ঘটিয়ে পরিবেশ বিনষ্টকরণ, পুকুর, খালবিল, নদীনালা ভরাটকরণ, শব্দ ও বাতাস দূষণ, সর্বোপরি মানবকল্যাণ পরিপন্থী সবধরনের কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।

বৃক্ষপ্রেমী আফতাব চৌধুরীকে ব্যক্তি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল জাতীয় ১ম পুরস্কার স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যম তাকে এ সম্মান (স্বর্ণপদক, সনদপত্র ও ১০ হাজার টাকা) প্রদান করেন। দেশের সর্বোচ্চ স্বীকৃতিতে সারাদেশে বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে ধন্য ধন্য আওয়াজ শুরু হয়েছিলো। সবাই দারুণ উল্লাস শুরু করেন-এতদিন পর একজন যোগ্য লোক তার মৌলিক কার্যক্রমের স্বীকৃতি পেয়েছেন। দেশ ও বিদেশ থেকে আসতে থাকে অসংখ্য অভিনন্দন। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা থেকে সংবর্ধনার আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হলে আফতাব চৌধুরী বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আফতাব চৌধুরী বলেন, বৃক্ষরোপণ করে বনাঞ্চল সৃষ্টি করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি সকলের প্রতি বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণের অনুরোধ জানিয়ে পরিবেশের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। তার মতে এটা করতে ব্যর্থ হলে আমাদের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

আফতাব চৌধুরী আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ, আমাদের সামনে এক অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি যেমন সাংবাদিক-কলামিস্ট হিসেবে নন্দিত তেমনি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন অবিরাম গতিতে। সহজ-সরল ওঠা-বসা, চলাফেরা আর শাদাসিধে জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত।

কলমসৈনিক আফতাব চৌধুরীর বিভিন্ন বই পড়ে দেশ-বিদেশে পণ্ডিত, সাহিত্যিক, আমলা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্নভাবে তার লেখালেখির প্রশংসা করেছেন। তারা শুধু তার লেখার বিষয়-আশয় আর বই নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, অনেকে এই বই যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের চিন্তার খোরাক ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন। তারা আশা প্রকাশ করে বলেছেন, আফতাব চৌধুরী নবপ্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস। তার লেখাগুলো একজন সমাজকর্মীর অন্তর প্রেরণার ফসল। যখন যা লেখকের দৃষ্টিপাতে এসেছে সেটি-ই তার মনের আয়নায় বড় হয়ে ধরা পড়েছে। একজন দক্ষ কথাশিল্পীর যাদুস্পর্শ হয়তো লেখাগুলোতে নেই কিন্তু তাতে রয়েছে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত মনের আনন্দ-আবেগ।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মুফলেহ আর ওসমানী কলমযোদ্ধা আফতাব চৌধুরীর বই পড়ে বলেন :

www.pathagar.com

> 'নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা, দর্শন, অনুভূতি ও উপলব্ধি সকল মানুষই সহজাতভাবে প্রকাশ করতে চায়। অন্য সত্তার সাথে বিনিময় ও দেয়া-নেয়ার মধ্যে দিয়ে অন্যকে নিবিড় করে জানতে চায়। স্বকীয় চেতনায় অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। নিজের সৃজনধর্মী প্রতিভার প্রকাশের মাঝে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মচেতনার সন্ধান চায়। কেউ পারে। কেউ পারে না। আমার ক্ষুদ্র মতে আফতাব চৌধুরী অবশ্যই পেরেছেন'।

পুলিশের সাবেক আইজি, ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও পূবালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ই এ চৌধুরী আফতাব চৌধুরীর লেখা বই পড়ে লিখেছেন :

> বই এবং প্রচ্ছদ ভাষা ও বর্ণনা খুবই আকর্ষণীয়। সুলিখিত ও দৃষ্টিনন্দন বই সমাজকে উপহার দানের জন্য তিনি জনাব চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বইগুলোর বহুল প্রচার কামনা করেন। তিনি বলেন, 'বইগুলো পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে, সন্দেহ নেই।'

বাংলাদেশ নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমশিনার PJ Fowler আফতাব চৌধুরীকে এক লিখিত চিঠিতে তার বইগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত David N. Merrillও বলেছেন আফতাব চৌধুরীর লেখা বই তাকে বাংলাদেশ সম্বন্ধে নতুন ধারণা ও নির্দেশনা প্রদান করবে। তিনি লেখক হিসেবে আফতাব চৌধুরীর সফলতা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হওয়ায় আফতাব চৌধুরী তাকে অভিনন্দন জানান। তার উত্তরে ১৯৯৩ সালের ১৯ জানুয়ারি বিল ক্লিনটন এক চিঠির মাধ্যমে জনাব চৌধুরীর অভিনন্দনের জবাব প্রদান করেন, তার সুন্দর ও সুখী জীবন কামনা করেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারিকেও আফতাব চৌধুরী সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানালে লেঘারি জনাব চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখেন।

আফতাব চৌধুরীর নিরপেক্ষ নীতি এবং গ্রহণযোগ্যতার কারণে তার লেখা যেমন বাংলাদেশের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ঠিক তেমনি তার বহু প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছে বিভিন্ন স্মারক, ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায়। তার

www.pathagar.com

লেখা বইগুলো নিয়েও বহুল প্রশংসা করে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন সময় প্রায় সব স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায়।

আফতাব চৌধুরী বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। সামাজিক, বৈষয়িক, বুদ্ধিভিত্তিক এমনকি সাংসারিক জীবনেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর সাফল্যের যাত্রা এখনো অব্যাহত। নিজের বহুমাত্রিক গুণাগুণ ছাড়া এত বিপুল অর্জন সম্ভব নয়। কোনো গোষ্ঠী বা গ্রুপের আনুকূল্যে নয়, তিনি এগিয়ে এসেছেন একান্তই আপন প্রতিভায়। শাদাসিধে জীবন ও উচ্চচিন্তায় উদ্দীপ্ত মানুষটি ব্যক্তিজীবনে সুশৃঙ্খল ও সময়ানুবর্তী, পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান। পরিচিত মহলে এজন্য তিনি নন্দিত।

আফতাব চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে একজন সুখী মানুষ। স্ত্রী হামনা খানম চৌধুরী তার প্রেরণার উৎস। তিন ছেলে সন্তানের জনক তিনি। তার বড় ছেলে মাহবুব ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করে অস্ট্রেলিয়ায় এমএস করে ওখানে চাকরিরত। দ্বিতীয় ছেলে মারুফ আমেরিকায় এবং তৃতীয় ছেলে মাসুদ বিবিএতে অধ্যয়নরত।

জনাব চৌধুরী সময়ের সাথে যুদ্ধ করে সমস্ত প্রতিকূলতা ও বৈরিতাকে পরাজিত করে সাফল্যের সিঁড়ি টপকে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সুকুমার বৃত্তি ও অধ্যবসায় নিবেদিতপনাকে আমাদের চলমান জীবনের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করে কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই সবুজ, সুন্দর, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। তার প্রতি থাকলো আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা।

ঢাকা
২৬ ডিসেম্বর ২০০৮

সাদিয়া চৌধুরী পরাগ
কবি ও কথা সাহিত্যিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

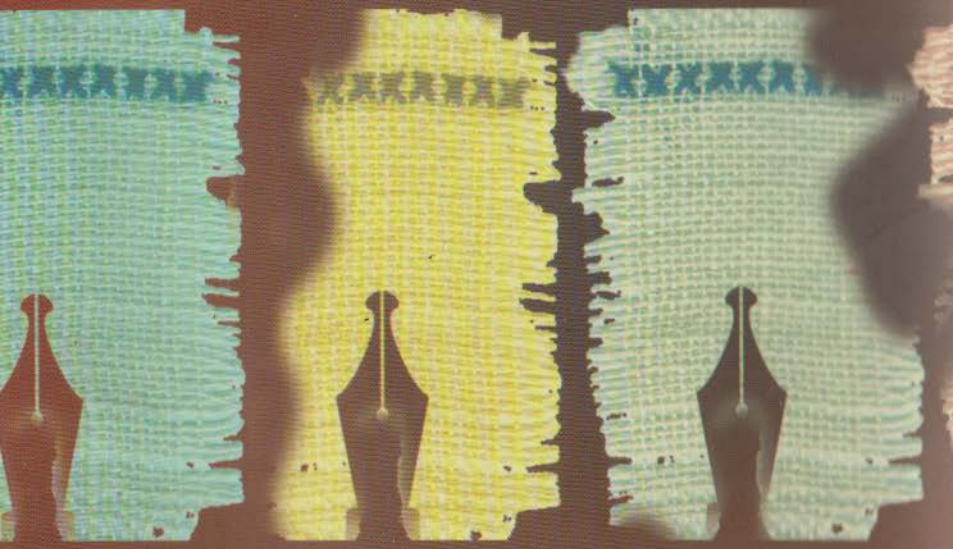

published by

mustafa salim

utso prokashan

127 aziz super market (2nd flr.)
shahbag dhaka. Tel : + 88 02 9676025

cover design

samar majumdar

Price taka 200 only (£ 3)

ISBN 984-70059-0100-7